মধ্য যুগের ইতিহাস

Recommended by the Board of Secondary Education W.B.
as a Text Book on History for Class VII
for all Schools of West Bengal
[Vide Notification No. T. B/VII/H/81/14 Dt. 8. 1. 81]

মধ্যযুগের ইতিহাস

(সপ্তম শ্রেণীর জন্য)

শ্রীমদন মোহন আচার্য এম্-এ (ট্রিপল) ; বি. টি.
শিক্ষক, (ইতিহাস বিভাগ) রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়, নরেন্দ্রপুর।

ও

শ্রীঅসিতবরণ জানা এম্-এ ; বি. এড
শিক্ষক, (ইতিহাস বিভাগ) রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া।

সোনা বুক এজেন্সী
৪৭/২৪এ, রামকৃষ্ণ ঘোষ রোড,
কলিকাতা-৭০০০৫০
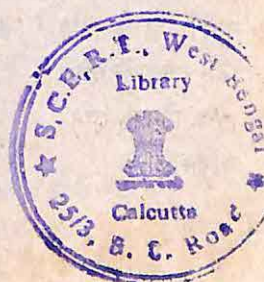
SYLLABUS ON HISTORY

Class-VII

HISTORY OF MEDIEVAL CIVILISATIONS

1. Meaning of the term Medieval :
2. The Middle Ages in the West :
3. The myth of "dark age" in Europe :
4. The Byzantine Civilisation :
5. Islam and its impact :
6. Western Europe in Medieval Period (800-1200 A. D. approx.) :
7. Feudalism in Medieval Europe :
8. The Crusades : (1st, 3rd, 4th)

Motives—Impact upon society and culture-new towns and trade centres (Italy in particular), cottage industries separated from agriculture (11th & 12th centuries.)

9. Growth of Towns-Role of the Crusades-Guilds in towns-their activities-a short account of life in towns. Town autonomy by royal charter ; origin of the term "Bourgecis".

10. The Far East in the middle Ages :

(i) China in Medieval Period (from early 7th century to 14th Century).

(ii) Japan in Medieval period :

11. India in the Middle Ages :

(a) After the Guptas (5th-7th century). Hun incursions from 458 (occupation of the Huns.) Break up of the Gupta Empire ; Age of Harsavardhan, Shrinking of the ideal of imperial unity to only Uttarpathanath : Hiuen Tsang's travels his account ; Nalanda-main features of the University.
(b) Post Harshavardhan period (8th to 12th century).

12. India's foreign contacts :

13. The Sultans of Delhi (1206 to 1526 A. D.)

Coming of Turko-Afghans to India (only a brief reference

to the motive and manner of their coming) ; Main features of political, Social and economic life ; Mutual influence of Hinduism and Islam ; liberal developments in Arts and Culture, translation of classics, Bhakti Cult (the medieval Saints) Sri Chaitanya, Nanak and Kabir. Bengal—Social, cultural and economic conditions in Ilias Shah and Hussain Shah's periods. Short account to the general administrative system.

14. Towards the end of the Medieval era (14th & 15th centuries).

Fall of Constantinople its impact on the Renaissance which had already started in the West.

* Features of the Renaissance era-Spirit of enquiry and reasoning, widening of frontiers of knowledge, Scientific discoveries based on "obsecured facts", geographical discoveries its outcome.

* National States-France, England, Portugal, Spain, Struggle for National Freedom (Dutch).

* Expansion of Europe.

* Old Order Vs. New order-The English revolt. Topies with asterisks should only be used as reference, as a conclusion to the old era and introduction of a new era.

* * *For details syllabus please see the contents.*

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

॥ মধ্যযুগ কাকে বলে ॥
(Meaning of the term "Medieval")

মানব জাতির ক্রমোন্নতির ধারাকে বলা হয় ইতিহাস। নিরবচ্ছিন্ন ভাঙ্গাগড়ার মাধ্যমে চির প্রবাহমান ইতিহাস এগিয়ে চলে নতুন থেকে নতুনতর পথে। এই ভাঙ্গাগড়ার পথে এগিয়ে চলার মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছে নতুন সমাজ ও সভ্যতা—নতুন ঐতিহাসিক যুগ। ইতিহাসের এগিয়ে চলার ধারা সবসময় একই বৈশিষ্ট্য নিয়ে চলে না। কোন কোন সময় এগিয়ে চলার পথে দেখা যায় নতুন বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের তারতম্যের ওপর ভিত্তি করেই নতুন ঐতিহাসিক যুগের সূচনা হয়।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগে (৪৭৬ খ্রীস্টাব্দে) একদা বিশাল শক্তিশালী রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটে, বিভিন্ন বর্বর জাতির আক্রমণে। প্রশ্ন হল, **বর্বর কাদের বলা হয়?** বর্বর বলতে তাদেরই বোঝানো হয়, যারা রোম সাম্রাজ্যের বাইরে বাস করত এবং সভ্যতার বিচারে রোমানদের তুলনায় হীন ছিল। সাধারণতঃ **গথ, ভ্যাণ্ডাল, ফ্রাঙ্ক** প্রভৃতি জার্মান উপজাতিদের বলা হত **বর্বর**। এদের আক্রমণে রোম সাম্রাজ্য ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায় এবং ইওরোপে ছোট ছোট বর্বর রাজ্য গড়ে ওঠে। রোম সাম্রাজ্যের পতনকেই আমরা ইওরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগের সূচনা বলে ধরে নিতে পারি। এই মধ্যযুগ স্থায়ী হয়েছিল একটানা প্রায় হাজার বছর ধরে। **পঞ্চম শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত কালকেই অধিকাংশ পণ্ডিত মধ্যযুগ আখ্যা দিয়ে থাকেন।** এ যুগের ইতিহাসে সাধারণ মানুষের ভূমিকা বিশেষ কিছু ছিল না। সমাজে কর্তৃত্ব করত সামন্ত প্রভুরা এবং ধর্মযাজকরা। মানুষের উন্নতি, আবিষ্কার ও সংস্কৃতির ধারা বহুল পরিমাণে ব্যাহত হয়েছিল এই সময়ে।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইওরোপের ইতিহাসে দেখা দিল নতুন বৈশিষ্ট্য। ধর্মীয় প্রভুত্ব ও গোঁড়ামির অবসান ঘটিয়ে প্রাচীন গ্রীক—রোমান সংস্কৃতির পুনরভ্যুদয় ঘটল। মানুষ ফিরে পেল চিন্তার স্বাধীনতা। নবচেতনার উন্মেষ ঘটল। মধ্যযুগের চিন্তায় সমগ্র ইওরোপ এক বিরাট অখণ্ড খ্রীস্টান সমাজরূপে গণ্য হত। পোপ ছিলেন খ্রীস্টানদের ধর্মগুরু এবং একই পুরোহিত শ্রেণীর অধীনে নানাদেশের জনসাধারণ এক সূত্রে বাঁধা পড়েছিল। নবচেতনা ও স্বাধীন চিন্তার ফলে ধর্মাধিষ্ঠানের কর্তৃত্বের অবসান হল। জাতীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ দেখা দিল। বিভিন্ন দেশের রাজারা নিজ নিজ এলাকার মধ্যে স্বাধীন হয়ে উঠলেন। শিক্ষা সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুসন্ধিৎসার জন্য আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম হল, ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষার সূচনা হল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও দেখা দিল এক বিরাট পরিবর্তন। নতুন নতুন জলপথ আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে পৃথিবীজোড়া বাণিজ্যের সম্ভাবনা দেখা দিল। ফলে উৎপাদন ব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটল। এইভাবে পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে নতুনতর বৈশিষ্ট্য দেখা দেওয়ার ফলে মধ্যযুগের অবসান সূচিত হল।

ভারতবর্ষে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকে মধ্যযুগের সূচনা হয়েছিল বলা যায়। রাজনৈতিক ঐক্য, সাহিত্য-শিল্পের উৎকর্ষ, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ইত্যাদি বিভিন্ন দিক দিয়ে গুপ্তসাম্রাজ্য ছিল ইওরোপের রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু রোম সাম্রাজ্যের মত গুপ্ত সাম্রাজ্যও আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার জন্য দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। **পঞ্চম শতাব্দী থেকেই ভারতীয় সমাজে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্য করা যায়।** ভূস্বামীরা দেশের কৃষিজমিগুলো দখল করে নেয়। দাসদের শ্রমে গড়ে ওঠা স্বাধীন কৃষকশ্রেণী বিলুপ্ত হয়। দাস প্রথার বিলুপ্তি ঘটে। ভূমিহীন কৃষকরা বাস করত ভূস্বামী সামন্ত প্রভুদের অধীনস্থ জমিতে। এই জমিগুলো রাজারা ভূস্বামীদের জায়গীররূপে বন্দোবস্ত দিতেন।

ভারতীয় সামন্ত সমাজে কৃষকরা গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন যাপন করত।

গ্রামের প্রান্তে থাকত সর্বসাধারণের চারণভূমি। খাদ্য, বস্ত্র, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি প্রায় সকল জিনিষই গ্রামে উৎপন্ন হত। কৃষকদের উৎপন্ন শস্যের প্রায় অর্ধাংশ খাজনা হিসেবে ভূস্বামীকে দিতে হত। কৃষকরা বাস করত অতিশয় দারিদ্র্যের মধ্যে। রাস্তাঘাট তৈরী ও সংস্কার, সেচখাল খনন, মন্দির ইত্যাদি তৈরীর জন্য বাধ্যতামূলক বেগার শ্রমের রীতি প্রচলিত ছিল। সমাজে ব্রাহ্মণ ও পুরোহিত শ্রেণী বিশেষ অধিকার ভোগ করতেন। তাদের অধীনে অনেক নিষ্কর ভূমি থাকত।

প্রায় সমগ্র মধ্যযুগের ইতিহাসে, দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া, ভারতবর্ষে ঐক্যবদ্ধ কোন সাম্রাজ্য গড়ে ওঠেনি। বিভিন্ন অঞ্চল ছিল বিভিন্ন ছোট বড় রাজার অধীন। এই সব রাজাদের যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত। বিদেশীরাও এই সময় কয়েকবার ভারত আক্রমণ করে। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে ভারতে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। মোগলদের অধীনে ভারত ঐক্যবদ্ধ হয়। সামন্ততান্ত্রিক যুদ্ধবিগ্রহের অবসান হয়।

যেমন ইওরোপের ক্ষেত্রে খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত কালকে মধ্যযুগ বলে ধরা হয়, তেমনি ভারতের ইতিহাসেও মোটামুটি ঐ একই সময়কে মধ্যযুগ বলা যেতে পারে। উভয়ক্ষেত্রেই এই সময় সীমার মধ্যেই মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্য করা যায়।

কিন্তু, কোন বিশেষ তারিখ বা সময় থেকে মধ্যযুগের সূচনা হয়েছিল এবং কোন নির্দিষ্ট সময়ে মধ্যযুগের পরিসমাপ্তি ঘটেছে—এরূপ ধারণা করা ভুল হবে। কোন ব্যক্তির জীবনে যেমন কোন নির্দিষ্ট বছরে যৌবন বা বার্দ্ধক্য আসেনা। তেমনি সমাজ জীবনের পরিবর্তন হঠাৎ অনুভূত হয় না। নতুন ধ্যানধারণার দ্বারা সমাজের সকল শ্রেণীই একই সঙ্গে প্রভাবিত হয় না। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে দেখতে গেলে প্রাচীন যুগ ক্রমে ক্রমে মধ্যযুগে পরিণতি লাভ করেছে। পৃথিবীর সব জায়গায় একই সঙ্গে সমানভাবে পরিবর্তন আসেনি। প্রাচীনযুগের কোন কোন বৈশিষ্ট্য যেমন মধ্যযুগের বহুকাল পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। তেমনি অনেক সময় দেখা যায় মধ্যযুগের কোন কোন

বৈশিষ্ট্য প্রাচীনযুগেই প্রকাশ লাভ করেছে। সুতরাং প্রাচীনযুগ ও মধ্যযুগের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা টানা সম্ভব নয়।

এই কারণেই, পৃথিবীর সব জায়গায় একই সঙ্গে মধ্যযুগের সূচনা হয়েছে এবং একই সময়সীমা পর্যন্ত এই যুগের অস্তিত্ব ছিল—একথা বলা সম্ভব নয়। এছাড়া প্রত্যেক অঞ্চলের পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্যের জন্য বিভিন্ন দেশের ইতিহাসের ঘটনাবলীর মধ্যেও রয়েছে বৈচিত্র্য।

অনুশীলনী

১। কোন্ ঘটনাকে ইওরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগের সূচনা বলা যায়? ইওরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগের স্থায়িত্ব কতটা?

২। ইওরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্য কি?

৩। ভারতের ইতিহাসে মধ্যযুগের সূচনা কি করে হয়?

৪। **কম কথায় উত্তর দাও :**

(ক) কত খ্রীস্টাব্দে রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটে?

(খ) বর্বর কাদের বলে?

(গ) কোন্ সময়কে আমরা মধ্যযুগের সূচনা বলে ধরে নিতে পারি?

(ঘ) কোন্ সময় মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়?

(ঙ) কোন্ যুগকে ভারতীয় স্বর্ণযুগ বলা হয়?

৫। **শূন্যস্থান পূরণ কর :**

(ক) — খ্রীস্টাব্দে রোম সাম্রাজ্যের পতন হয়।

(খ) ইওরোপে নবজাগরণের সূচনা হয় — শতাব্দীতে।

(গ) — সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকে ভারতে মধ্যযুগের সূচনা হয়েছিল বলা যায়।

(ঘ) গুপ্ত সাম্রাজ্য ছিল ইওরোপের — সাম্রাজ্যের সঙ্গে তুলনীয়।

(ঙ) প্রাচীন রোম সমাজে — শ্রেণীর লোক ছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

॥ **পশ্চিম জগতে মধ্যযুগ** ॥

(The Middle Ages in the west)

খ্রীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে উত্তর ইওরোপের রাইন, ডানিয়ুব ও ভিশ্চুলা নদী এবং বাল্টিক ও উত্তর সাগর বেষ্টিত অঞ্চলে বাস করত বিভিন্ন জার্মান উপজাতি। যেমন গথ, ভ্যাণ্ডাল, ফ্র্যাঙ্ক, এ্যাঙ্গল, জুট, লোম্বার্ড, বার্গাণ্ডীয় ও স্যাক্সন ইত্যাদি। এছাড়া স্লাভ ও সিথিয়ানরা বাস করত রুশদেশের সমভূমি অঞ্চলে। রোমানদের মত এরা সভ্য ছিল না। তাই এদের বলা হত বর্বর। খাদ্য ও আশ্রয়ের সন্ধানে এরা মাঝে মাঝে রোম সাম্রাজ্যের সীমান্তে হানা দিত। জুলিয়াস সীজার যখন রোমের সেনাপতি ছিলেন, তখন তিনি তাদের দমন করেছিলেন। তা সত্ত্বেও জুলিয়াস সীজার থেকে শুরু করে সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াসের সময় পর্যন্ত জার্মান উপজাতিদের সঙ্গে রোম সাম্রাজ্যের সম্পর্ক ছিল মোটামুটি শান্তিপূর্ণ। উপজাতিগুলো জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহের ফলে মাঝে মাঝে রোম সাম্রাজ্যে প্রবেশ করত। অপরদিকে রোমীয় জনসংখ্যা কমে যাওয়ার ফলে তারা রোমের সৈন্যদলে সৈনিক বৃত্তিও গ্রহণ করত। জার্মান উপজাতীয় বহুলোক ইটালিতে স্থায়ীভাবে বসবাসও করত। তারা রোমীয় সভ্যতা ও জীবনযাত্রা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু, এই ধরনের শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বেশীদিন টিকল না। **হুণ নামে মধ্য এশিয়ার এক মঙ্গোলীয় যাযাবর জাতি ইওরোপে প্রবেশ করে সবকিছু ধ্বংস করে, এক দারুণ আতঙ্কের সৃষ্টি করে।** এই হুণদের প্রবল চাপে জার্মান উপজাতিগুলো রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে বিপুল সংখ্যায় প্রবেশ করতে বাধ্য হল। এইভাবে জার্মান উপজাতিদের সঙ্গে রোম সাম্রাজ্যের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

বলিষ্ঠ ও কুৎসিত দর্শন, যাযাবর হুণরা দুটি দলে বিভক্ত ছিল—

হুণ ও সাদা হুণ। খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতাব্দী থেকে সাদা হুণরা ইওরোপে অভিযান চালাতে থাকে। রোমানরা ও জার্মান উপজাতিরা সকলেই তাদের ভয় করত। ইওরোপে হুণরা প্রথমে আক্রমণ করে গথদের। গথরা বিভক্ত ছিল দুটি প্রধান অংশে, অস্ট্রোগথ বা পূর্বগথ এবং ভিসিগথ বা পশ্চিম গথ। অস্ট্রোগথরা হুণদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে না পেরে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং কেউ কেউ ক্রীতদাসে পরিণত হয়। ভিসিগথরা হুণদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য রোম সম্রাট

হুণ যোদ্ধা

ভ্যালেনস এর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং আশ্রয় পেয়ে তারা বেশ সুখে শান্তিতে বাস করতে থাকে। রোমীয় রাজপুরুষদের অত্যাচার ও দুর্ব্যবহারের ফলে ভিসিগথরা রোম সম্রাট ভ্যালেনস-এর বিরুদ্ধে ৩৭৮ খ্রীস্টাব্দে এক বিদ্রোহ করে। সম্রাট স্বয়ং বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হন। ভ্যালেনস-এর উত্তরাধিকারী থিয়োডোসিয়াস এই বিদ্রোহ দমন করেন। ভিসিগথ নেতা এলারিক তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। **৩৯৫ খ্রীস্টাব্দে থিয়োডোসিয়াসের মৃত্যুর সময় রোম সাম্রাজ্য দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়।** পূর্বাংশ বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য নামে পরিচিত হয় এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত টিকে থাকে। এর রাজধানী ছিল কনস্ট্যান্টিনোপল। পশ্চিম সাম্রাজ্যের রাজ ধানীছিল রোম। সাম্রাজ্য বিভক্ত হবার ফলে, যে দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল ভিসিগথরা তার সুযোগ গ্রহণ করল। পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম দিকে এলারিকের নেতৃত্বে তারা

ইতালি আক্রমণ করে। রোমানরা প্রথমে সন্ধির প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু ৪১০ খ্রীস্টাব্দে এলারিক রোম বিধ্বস্ত করেন। রোমের ক্রীতদাসরা বিজয়ীদের পক্ষ অবলম্বন করে রাজধানীর দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল।

রোমের পতনের পরই এলারিকের মৃত্যু হয় এবং পশ্চিম গথরা ক্রমশ দক্ষিণ গলদেশ ও স্পেনে নিজেদের শাসন কায়েম করে। পরবর্তী ৫০।৬০ বছর ধরে বিভিন্ন জার্মান উপজাতিরা প্রায় অবিচ্ছিন্নভাবে রোম সাম্রাজ্যের উপর আক্রমণ চালায়। ইতালী বিধ্বস্ত হবার পর রোম একটি প্রাদেশিক শহররূপে টিকেছিল। পশ্চিম রোম সম্রাট-গণ ছিলেন জার্মান উপজাতীয় নেতাদের হাতের পুতুল। অবশেষে
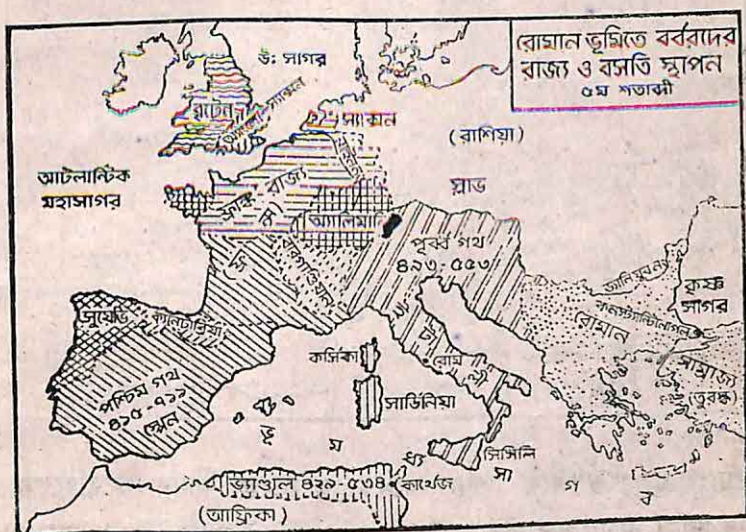
৪৭৬ খ্রীস্টাব্দে ওডোয়েকার নামে একজন বর্বর নেতা শেষ সম্রাট রোমুলাস আগাস্টুলাসকে হত্যা করে, নিজেকে ইতালীতে বাইজাণ্টাইন সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে দাবী করেন। এইভাবে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। পশ্চিমে রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ জার্মান উপজাতিদের হস্তগত হয়। ফ্রান্সের ফ্র্যাঙ্করা, ফ্রান্সের পূর্বদিকে বার্গাণ্ডিয়ানরা, স্পেনে ভিসিগথরা, পর্তুগালে সুয়েভিরা এবং আফ্রিকায় ভ্যাণ্ডালরা রাজত্ব করতে থাকে।

৪৭৬ খ্রীস্টাব্দে রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটলেও রোমীয় আইন কানুন ও সাম্রাজ্যের ঐক্য সম্বন্ধে রোমীয় ধারণার অবসান ঘটেনি। ১৩ বছর রাজত্ব করবার পর ওডোয়েকার অস্ট্রোগথদের দ্বারা আক্রান্ত হন। বাইজাণ্টাইন সম্রাটের আদেশে অস্ট্রোগথরা ইতালী আক্রমণ করে এবং তাদের নেতা থিয়োডোরিক, ওডোয়েকারকে হত্যা করে ইতালিকে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য বা বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যের অধীন করেন। ইতালির নতুন অধীশ্বর থিয়োডোরিক জার্মান উপজাতীয় হলেও রোমের আইন কানুন রীতিনীতি সযত্নে রক্ষা করেছিলেন। বাইজাণ্টাইন

বর্বরদের আক্রমণ ও বসতি বিস্তার
৫ম শতাব্দী
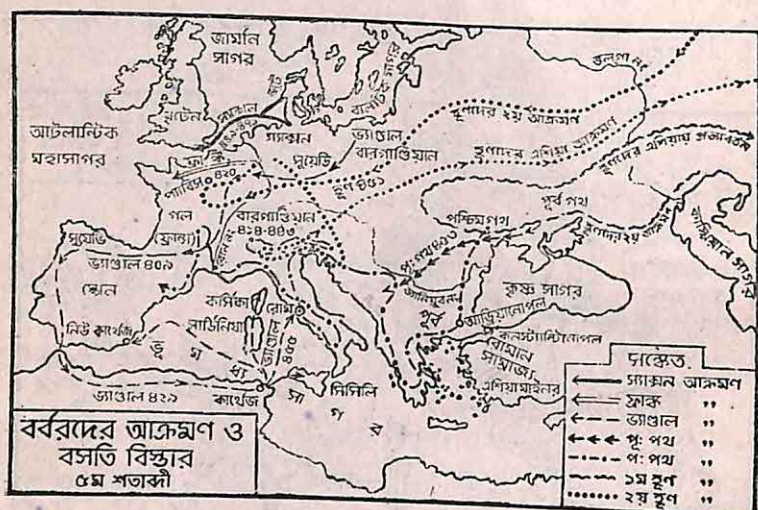
সাম্রাজ্যের অনুকরণে তিনি অনেক স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন। এই ভাবে সাম্রাজ্যের পতন ঘটলেও বাস্তবে ঐক্যবদ্ধ কোন সাম্রাজ্য না থাকলেও, ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যের ধারণার অবসান ঘটেনি। রোমীয় আইন কানুনও ছিল প্রচলিত।

এলারিক (Alaric): এলারিক ছিলেন পশ্চিমগথ বা ভিসিগথদের নেতা। হুণদের আক্রমণে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বিভিন্ন জার্মান উপজাতিরা যখন রোম সাম্রাজ্যে প্রবেশ করতে শুরু করে, সেই সময় তিনি রোম সম্রাটকে পরাজিত করে ইটালি দখল করেন। এইভাবে তিনি রোমের পতনের পথ সুগম করেন। রোম বিজয়ের পর তিনি

দক্ষিণ ইটালিতে যান এবং সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। নইলে ইটালিতে প্রথম জার্মান উপজাতীয়দের রাজ্য প্রতিষ্ঠার গৌরব তাঁর প্রাপ্য হত।

এটিলা (Atilla) : এটিলা ছিলেন খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর একজন দুর্ধর্ষ, নিষ্ঠুর ও প্রতিভাবান হুণ নেতা। তাঁর পিতার নাম মান্দজাক। হুণদের বিচ্ছিন্ন দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করে তিনি এক বিরাট সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন। তিনি বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্য আক্রমণ করে, সেখানকার সম্রাটকে বিপুল অর্থ রাজস্ব হিসাবে দিতে বাধ্য করেন। ৪৫০ খ্রীস্টাব্দে তিনি পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। রোমান বীর ইটিয়াসের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ রোমান ও বর্বর বাহিনী তাঁকে পরাজিত করে (৪৫১)। এরপর এটিলা ইতালির উত্তরাঞ্চলে বহু শহর লুণ্ঠন করলেও নতুন করে কোন দেশ জয়ের চেষ্টা করেন নি। ৪৫৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। ইতিহাসে তিনি **'ঈশ্বরের অভিশাপ'** নামে কুখ্যাত; এশিয়া ও ইওরোপের অন্তর্গত এক বিরাট অংশে তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। এই সাম্রাজ্য তাঁর মৃত্যুর পর ভেঙ্গে পড়ে ও হুণরা স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে ধীরে ধীরে মিশে যায়।

গেইসেরিক (Gaeseric) : গেইসেরিক ছিলেন ভ্যাণ্ডালদের নেতা। তিনি প্রথমে স্পেন দখল করেছিলেন। পরে তিনি রোমের আফ্রিকান সাম্রাজ্য দখল করেন। তিনি একটি বিরাট নৌবহরের অধিকারী ছিলেন এবং ভূমধ্যসাগরে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। ৪৫৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি ইতালি আক্রমণ করে রোম শহরটি দখল করেন এবং পুরো দু'সপ্তাহ ধরে শহরটি লুণ্ঠন করেন। তাঁর সৈন্যবাহিনী মাঝে মাঝে বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যেও হানা দিত। তিনি উত্তর আফ্রিকা ও পশ্চিম ভূমধ্যসাগরের দ্বীপগুলোর অধীশ্বর ছিলেন। ৪৭৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি মারা যান।

রোম সাম্রাজ্যে অভিবাসনকারী জার্মান উপজাতিদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবন (social, political and religious life of the migrants) :

প্রাচীন জার্মান উপজাতিগুলো যাযাবর ছিল না। কিন্তু খাদ্য ও আশ্রয়ের সন্ধানে তারা মাঝে মাঝে বসতি পরিবর্তন করত। এদের সমাজ ছিল আদিম পিতৃতান্ত্রিক এবং বড় বড় পরিবার নিয়ে গঠিত যুথ গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল তারা।

জার্মান উপজাতীয়দের সম্বন্ধে তথ্যাদি আমরা পেয়েছি, রোমের শ্রেষ্ঠ বীর জুলিয়াস সীজারের কাছ থেকে, যিনি তাদের বিরুদ্ধে একবার যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন এবং রোমান ঐতিহাসিক ট্যাসিটাসের কাছ থেকে, যিনি তাদের জীবনযাত্রা নিয়ে গবেষণা করেছিলেন।

এদের শারীরিক গঠন ছিল দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ, চুল ছিল তামাটে, চোখ ছিল নীলাভ। এদের ভাষা ছিল আর্য ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্গত। অর্থাৎ যে মূল ভাষা থেকে সংস্কৃত, গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষার সৃষ্টি হয়েছে, সেই মূল ভাষা থেকে এদের ভাষারও উৎপত্তি।

সুসভ্য রোমানদের তুলনায় এরা ছিল নিতান্ত অনুন্নত। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত গ্রামে ছিল এদের বাসকেন্দ্র। মাটি, খড় প্রভৃতি দিয়ে এরা ঘরবাড়ী তৈরী করত। প্রচণ্ড শীতেও জন্তুর চামড়ার সামান্য আবরণ এদের পক্ষে ছিল যথেষ্ট। মেয়েরা নিজেদের ব্যবহারের জন্য এক রকম মোটা সুতোর কাপড় তৈরী করত। মাছ ধরা, শিকার করা আর বলদে টানা লাঙ্গল দিয়ে সামান্য চাষবাস করা ছিল এদের উপজীবিকা।

গৃহস্থালীর সমস্ত দায়িত্ব ছিল মেয়েদের ওপর। সমাজে তাদের সম্মান ছিল পুরুষদের সমান। সমাজ ছিল চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত সম্ভ্রান্ত, স্বাধীন জনসাধারণ, ভূমিদাস ও ক্রীতদাস। দাসরা প্রভুর সঙ্গে বাস করত এবং প্রভুর কাজে সাহায্য করত। রোমান সমাজের তুলনায় জার্মান উপজাতীয় সমাজে দাসরা সহৃদয় ব্যবহার পেত এবং তাদের কিছু কিছু অধিকারও দান করা হয়েছিল।

অনুন্নত, আদিম জীবনযাত্রা স্বাভাবিকভাবে এদের তেজস্বী, অসমসাহসিক, দুর্দান্ত ও যুদ্ধপ্রিয় করে তুলেছিল। ফলে বিলাসী, অলস ও ক্রীতদাসদের উপর নির্ভরশীল রোমানদের তারা সহজেই পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছিল। যুদ্ধ বা বিপদের সম্মুখীন হলে

এরা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠত। এদের মর্যাদাবোধ ছিল গভীর। কোন চুক্তি বা অঙ্গীকার রক্ষার জন্য হাসিমুখে তারা যে কোন দুঃখ বরণ করত।

জার্মান উপজাতীয়রা গ্রামে বাস করত এবং প্রতিটি গ্রাম সম্প্রদায়গতভাবে গঠিত হত। কতকগুলো পরিবার মিলে একটি **'মার্ক'** বা **'ডফ'** বা গ্রাম গড়ে উঠত। প্রত্যেক গ্রামের স্বাধীন জনসাধারণদের নিয়ে গঠিত হত গ্রাম্য পঞ্চায়েত বা **'মুট'**। কতকগুলি মার্ক নিয়ে গঠিত হত এক একটি **হান্ড্রেড**। হানড্রেডের সমষ্টিকে বলা হত **'গ'**; আবার কয়েকটি 'গ' এর সম্মেলনে সৃষ্টি হত একটা গোটা উপজাতির বাসভূমি। প্রতিটি গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসী ছিল উপজাতির স্বাধীন সদস্য। এদের ওপরে ছিল সামরিক অভিজাত সম্প্রদায়। স্বাধীন ব্যক্তিদের তুলনায় এদের জমির পরিমাণ ছিল বেশী। এরা বেতনভোগী অনুচরদের নিয়ে দল গঠন করে, প্রতিবেশী উপজাতিদের ওপর আক্রমণ চালাত। কখনো কখনো অভিজাতদের কেউ কেউ নিজেকে রাজা হিসাবে ঘোষণা করত। বর্শা, তীর-ধনুক আর বর্ম ছিল এদের যুদ্ধের প্রধান উপকরণ। সেনাবাহিনী অশ্বারোহী ও পদাতিক এই দু'দলে বিভক্ত ছিল।

প্রাকৃতিক ঘটানাগুলোকে মানবীয় গুণে ভূষিত করে দেব-দেবীরূপে তারা পূজো করত। এটাই ছিল তাদের ধর্ম। তাদের কোন নির্দিষ্ট পুরোহিত শ্রেণী ছিল না। আকাশের দেবতা ছিল **ওডন,** পৃথিবীর দেবতা **হার্থা,** বজ্রের দেবতা **ডনর** বা **থর** আর ছিল উৎপাদনী শক্তির দেবী **ফ্রিয়া**। সূর্যকে তারা কল্পনা করত দেবীরূপে এবং চন্দ্রকে দেবতা রূপে। **সুন্না** ছিলেন সূর্যদেবী এবং **মানি** ছিলেন চন্দ্রদেব। ইংরেজীতে সপ্তাহের নামগুলো ঐ জার্মান দেব-দেবীদের নামানুসারেই রাখা হয়েছে :—

মানি (চন্দ্র দেবতা)—মানডে (সোমবার); টিউ (যুদ্ধের দেবতা)—টিউস ডে (মঙ্গলবার); ওডন (আকাশের দেবতা)—ওয়েড্‌ন্‌স্‌ ডে (বুধবার), থর (বজ্রের দেবতা)—থার্সডে (বৃহস্পতি বার); ফ্রিয়া (উৎপাদনী শক্তির দেবী)—ফ্রাই-ডে (শুক্রবার);

সোতের (অমঙ্গলের দেবতা)—স্যাটার ডে (শনিবার) ; সুন্না (সূর্যদেবী)—সান্ ডে (রবিবার) ।

রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে জার্মান উপজাতীয়রা স্থায়ী ভাবে বাস করতে শুরু করেছিল। ভ্যাণ্ডালরা উত্তর আফ্রিকা দখল করে নিয়েছিল। বার্গাণ্ডিয়ানরা দক্ষিণ-পূর্ব ফ্রান্সে বসতি বিস্তার করে। উত্তর ফ্রান্স দখল করে ফ্রাঙ্ক জাতি। স্যাক্সন ও এ্যাঙ্গল জাতি বৃটেন আক্রমণ করে কয়েকটি বর্বর রাজ্য স্থাপন করে, যা শেষ পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইংল্যাণ্ড নামে পরিচিত হয়। থিয়োডোরিকের নেতৃত্বে অস্ট্রোগথরা ইটালি জয় করেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে লোম্বার্ড নামে জার্মান উপজাতি ইটালিতে স্থায়ী প্রভুত্ব বিস্তার করে।

জাতিগত, ধর্মীয় ও ঐতিহ্যগত দিক থেকে জার্মান উপজাতীয় ও রোমানদের মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকলেও উভয় জনগোষ্ঠী শান্তিপূর্ণ ভাবে পাশাপাশি বাস করতে থাকে। রোমান আইন-কানুনই প্রচলিত ছিল। পরে ধীরে ধীরে জার্মান আইন-কানুন ও রীতিনীতি প্রচলিত হয়। কৃষিকার্য ও কর ব্যবস্থায় রোমান ব্যবস্থাই চালু ছিল। উভয় সমাজের মধ্যে অন্তর্বিবাহেরও প্রচলন হয়েছিল। রোম সাম্রাজ্যের সংস্পর্শে এসে তারা খ্রীস্টধর্মের প্রতি আসক্ত হন। জার্মান উপজাতীয়দের মধ্যে সর্ব প্রথম খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করে অস্ট্রোগথরা। **বিশপ উলফিলাস** তাদের খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন এবং বাইবেলের কিছু অংশ তিনি গথদের ভাষায় অনুবাদ করেন। অন্যান্য জার্মান উপজাতিগুলো আরও বহু বছর পরে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং এটা সম্ভব হয়েছিল খ্রীস্টান ধর্মযাজকদের নিষ্ঠা, আত্মত্যাগ ও ধৈর্যের ফলে। খ্রীস্টধর্ম শিক্ষা দিত, পরম পিতা বা ঈশ্বর সমগ্র বিশ্বে সর্বশক্তিমান ও অদ্বিতীয়। তাঁর নির্দেশিত পথ ছাড়া আর কোন পথ নেই। সুতরাং সৎ খ্রীস্টানদের দ্বিধাহীন চিত্তে ঈশ্বরের আনুগত্য পালন করা উচিত। মৃত্যুর পর পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে মতবাদ প্রচার করে খ্রীস্টানধর্ম জনসাধারণের আনুগত্যকে সুদৃঢ় করেছিল। যারা ভাগ্যকে শান্ত চিত্তে মেনে নিত ও পুণ্যের পথে অবিচলিত থাকত, মৃত্যুর পর অক্ষয় স্বর্গবাসের প্রতিশ্রুতি

তাদের দেয়া হত। অবিশ্বাসী ও পাপীদের জন্য অপেক্ষা করে থাকত নরক-যন্ত্রণা। খ্রীস্টধর্মের এই পারলৌকিক বিশ্বাস জার্মান উপজাতীয়-দের গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

অনুশীলনী

১। বিভিন্ন জার্মান উপজাতীয়দের নাম বল? কেন এদের বর্বর বলা হত?

২। জার্মান উপজাতিগুলো মাঝে মাঝে রোম সাম্রাজ্যে প্রবেশ করত কেন? কোন্ ঘটনায় তারা বিপুল সংখ্যায় রোম সাম্রাজ্যে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়।

৩। হূণ নেতা এটিলা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।

৪। জার্মান উপজাতীয়দের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন কিরূপ ছিল?

৫। জার্মান উপজাতীয়দের খ্রীস্টধর্ম কিরূপে প্রভাবিত করেছিল?

৬। **কম কথায় উত্তর দাও:**

(ক) গথরা কটি ভাগে বিভক্ত ছিল এবং কি কি?

(খ) রোম সাম্রাজ্য কবে বিভক্ত হয়? পূর্ব সাম্রাজ্যের রাজধানী কি ছিল?

(গ) কোন্ কোন্ জার্মান উপজাতি পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের কি কি অংশ দখল করেছিল?

(ঘ) জার্মান উপজাতিদের সমাজ কয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল?

(ঙ) জার্মান উপজাতীয় দেবদেবীর নাম বল।

৭। **সঠিক উত্তরের নিচে দাগ দাও:**

(ক) বর্বরদের দমন করেছিলেন (গেইসেরিক, জুলিয়াস সীজার, এলারিক)

(খ) রোমুলাস অগাস্টুলাসকে হত্যা করে (এটিলা, ওডোয়েকার, থিয়োডোসিয়াস)

(গ) ভ্যাণ্ডালদের নেতা ছিলেন (এলারিক, এটিলা, গেইসেরিক)

(ঘ) আকাশের দেবতা ছিল (ওডন, হার্থা, থর, সুন্না)

(ঙ) জার্মান উপজাতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেন (ফ্রাঙ্ক, ভ্যাণ্ডাল, স্যাক্সন, অস্ট্রোগথরা)

তৃতীয় অধ্যায়

॥ ইওরোপ 'অন্ধকার যুগের' গল্প কথা ॥
(The myth of "dark age" in Europe)

ইওরোপের ইতিহাসের মধ্যযুগকে ঐতিহাসিকরা সাধারণতঃ বলে থাকেন **'অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ'** বা **'ডার্ক এজ'**। এর প্রথম কারণ হল এসময়কার ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে শুরু করে প্রায় হাজার বছর কাল পর্যন্ত মধ্যযুগের ইতিহাস ছিল কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও মানসিক স্থবিরতার ইতিহাস। মধ্যযুগ যে অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ—এই ধারণার সৃষ্টি হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর ইওরোপে। ইওরোপে সে সময় যুক্তিবাদের সূচনা হয়েছিল। সে যুগের পণ্ডিতগণ মনে করতেন মধ্যযুগ ছিল অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন। এ ধরনের ধারণার পেছনে **আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা সত্যতা থাকলেও, মধ্যযুগ কিন্তু অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ ছিল না**। মধ্যযুগ সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞানের অভাবে এ ধরনের ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল।

পঞ্চদশ শতাব্দীর নবজাগরণ বা রেনেসাঁসের পূর্বেও দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইওরোপে প্রাথমিক রেনেসাঁস দেখা দিয়েছিল। এরও আগে নবম শতাব্দীতে সম্রাট **শার্লেমানের** উৎসাহে ও চেষ্টায় এক সাংস্কৃতিক জাগরণ দেখা দেয়। শুধু মাত্র চতুর্থ থেকে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত সময়ে বিদ্যাচর্চার তেমন কোন ব্যাপক প্রয়াস দেখা যায় নি। কিন্তু এই সময়কেও ঠিক অন্ধকারাচ্ছন্ন বলা যায় না।

রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর সারা ইওরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল অজ্ঞানতার অন্ধকার। জার্মান জাতির লোকেরা ছিল বর্বর, শিক্ষা-সাংস্কৃতি তাদের বিশেষ ছিল না, অবিরাম কাটাকাটি,হানাহানিতে তখন সারা ইওরোপ ছিল ছিন্নভিন্ন। অর্থনৈতিক দুর্দশা ও রাজনৈতিক অরাজকতায় ইওরোপীয় জীবনযাত্রা হয়েছিল বিপর্যস্ত। এই যুগের

কূপমণ্ডূকতা, অনিশ্চয়তা ও অশান্তি মানুষের জীবনকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল।

মধ্যযুগে খ্রীস্টান ধর্মাধিষ্ঠান ইওরোপে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। ইওরোপের অধিবাসীরা ধর্মে ছিল খ্রীস্টান। তাই খ্রীস্টান জগতের ধর্মগুরু পোপের ছিল সমগ্র ইওরোপের মানুষের ওপর অখণ্ড আধিপত্য। ইওরোপের কি রাজা, কি প্রজা সকলেই পোপের আনুগত্য স্বীকার করতেন। খ্রীস্টান চার্চের রীতিনীতি ও আদর্শ মধ্যযুগীয় মানুষের জীবনকে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। সমাজ জীবন নিয়ন্ত্রণ করতেন খ্রীস্ট ধর্মযাজকরা। চার্চের হাতে ছিল জ্ঞান বিদ্যার সমস্ত কর্তৃত্ব। সাধারণ মানুষের লেখাপড়া বন্ধ হল, বন্ধ হল ধর্ম নিরপেক্ষ জ্ঞানের চর্চা। প্রাচীনকালে গ্রীক ও রোমান পণ্ডিতরা যে ধরনের সাহিত্য রচনা করেছিলেন, তা করার কোন লোকই আর রইলেন না। যাজক ও তাদের সমর্থকরা শুধু ল্যাটিন ভাষায় পুঁথিপত্র লিখতেন ও পড়তেন। অশিক্ষিত সাধারণ মানুষের পক্ষে তা পড়ার বা বোঝার কোন সুযোগই ছিল না। মাতৃভাষার পরিবর্তে ল্যাটিন ভাষায় জ্ঞান চর্চা চলেছিল দীর্ঘদিন ধরে। আমাদের দেশেও মধ্যযুগে মাতৃভাষার পরিবর্তে সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিতেরা নানা শাস্ত্র লিখতেন এবং সাধারণ মানুষের পক্ষে তা ছিল দুর্বোধ্য।

মধ্যযুগের খ্রীস্টান যাজক সম্প্রদায় সাধারণতঃ ধনী ও ধর্মের ব্যাপারে দুর্নীতিপরায়ণ হলেও তারাই ছিলেন ইওরোপের একমাত্র শিক্ষিত শ্রেণী। যাজক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি অংশ শুদ্ধ, পবিত্র, সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করতেন এবং সাধারণতঃ বিদ্যাচর্চা ও ধর্মসাধনায় সম্পূর্ণভাবে ব্যাপৃত থাকতেন। এদের বলা হত **'মঙ্ক'** বা সন্ন্যাসী এবং এদের আবাস-স্থলকে বলা হত মঠ বা **'মনাস্টারি'**। আত্মত্যাগ, সেবা, দরিদ্র জীবন-যাপন, শুচিতা, ধর্মানুবর্তিতা ও বিদ্যাচর্চা ছিল এই সন্ন্যাসীদের আদর্শ।

এই সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ই মধ্যযুগে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। মঠে মঠে ছিল বড় বড় পাঠাগার, বিদ্যালয় প্রভৃতি। বিদ্যাচর্চা করে, স্থানীয় শিষ্যদের শিক্ষা দিয়ে, পাণ্ডুলিপি লিখে ও নকল

করে, নিয়মিত প্রার্থনা ও অন্যান্য নানা ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ ও নিয়ম পালন করে সন্ন্যাসীদের দিন কাটত। এদের মধ্যে অনেক প্রতিভাবান পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। **তাঁদের জ্ঞানবুদ্ধি, বিদ্যাচর্চা মানব সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করেছে। এদের আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও একাগ্র সাধনার জন্য মধ্যযুগের অনিশ্চিত জীবনযাত্রার মধ্যেও বহু জ্ঞান বিদ্যা একেবারে লুপ্ত হয়ে যাবার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল।**

শুধুমাত্র মনীষা ও বিদ্যাচর্চার জন্যই নয়, সন্ন্যাসীদের উন্নত চরিত্র ও নৈতিক গুণাবলী, মধ্যযুগে খ্রীস্টধর্ম বিশ্বাসীদের কাছে আদর্শ স্থাপন করেছিল। তাঁদের জীবনযাত্রা, শুদ্ধাচার, ন্যায়-অন্যায়ের ও পাপ পুণ্য সম্বন্ধে ধারণা মধ্যযুগে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। বিশৃঙ্খল, অর্থনৈতিক ও অরাজকতার পরিবেশে খ্রীস্টান সাধুরা সভ্যতার দীপালোকটি অনির্বাণ রাখতে পেরেছিলেন। খ্রীস্টান মঠগুলো ছিল, ক্লান্ত পথিকের বিশ্রামালয়; আর্ত, নিপীড়িত ও ক্ষুধার্তের আশ্রয়স্থল এবং রোগগ্রস্তদের আরোগ্যভবন!

মধ্যযুগের মানুষেরা মঠবাসী খ্রীস্টান সন্ন্যাসীদের কাছ থেকেই শিখেছিল বিনয়, মিতব্যয়িতা, নিয়মানুবর্তিতা এবং সামাজিক কর্তব্যবোধ। খ্রীস্টান সন্ন্যাসীদের শুভ বুদ্ধি ও ধর্মবোধ সমাজ জীবনে ছিল আদর্শ স্বরূপ। সন্ন্যাসীরা কেউ কেউ বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে ধর্মোপদেশ দিতেন। এই সন্ন্যাসীদের প্রচেষ্টার ফলে শুধু মাত্র ইওরোপের সর্বত্র খ্রীস্টধর্মই প্রচারিত হয় নি, ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত সামাজিক কর্তব্যবোধ, নৈতিকতা ইত্যাদি আদর্শের প্রচারও ঘটেছিল। মধ্যযুগের সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করতে এদের অবদান ছিল অপরিসীম।

অনুশীলনী

১। মধ্যযুগকে অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ কেন বলা হয়?

২। মধ্যযুগে কারা জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে রেখেছিলেন এবং কিভাবে?

৩। খ্রীস্টান সন্ন্যাসীদের জীবনযাত্রা কিরূপ ছিল?

৪। **টীকা লেখ:**

শার্লেমান, ডার্ক এজ, মনাস্টারি, মঙ্ক।

চতুর্থ অধ্যায়

॥ বাইজান্টাইন সভ্যতা ॥
(The Byzantine Civilisation)

(ক) কনস্ট্যাণ্টাইন কর্তৃক কনস্ট্যাণ্টিনোপল শহর প্রতিষ্ঠা এবং খ্রীস্টধর্মকে বাইজাণ্টিয়ামের রাজধর্মে পরিণত করা ঃ

৩৯৫ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট থিয়োডোসিয়াসের মৃত্যুর পর রোম সাম্রাজ্য দু'ভাগ হয়ে যায় পূর্ব সাম্রাজ্য ও পশ্চিম সাম্রাজ্য। এর প্রায় এক শতাব্দী আগেই ভাগ হয়ে যাবার প্রকৃত বীজ বপন করেছিলেন সম্রাট ডায়োক্লিসিয়ান। রাজধানী স্থাপনের জন্য রোমান সাম্রাজ্যের পূর্ব

পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য, রাজধানী—রোম।
পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য, রাজধানী—কনস্ট্যাণ্টিনোপল।

অঞ্চলই যে উপযুক্ত তা তিনি বুঝেছিলেন। তারপর ৩৩০ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট কনস্ট্যাণ্টাইন প্রাচীন গ্রীক শহর বাইজাণ্টিয়ামে নিজের

নামে নতুন রাজধানী কনস্ট্যান্টিনোপল প্রতিষ্ঠা করেন। এই কনস্টান্টিনোপলই বর্তমান তুরস্কের ইস্তাম্বুল শহর। সাম্রাজ্যের পুর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলো পশ্চিমাঞ্চলের তুলনায় অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে উন্নত ছিল। কাজেই পুর্বাঞ্চলে রাজধানী স্থানান্তর ছিল একটি যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ। এছাড়া কনস্ট্যান্টাইন বিরাট বিরাট রাজকীয় সৌধ নির্মাণ করে নতুন রাজধানীর শ্রীবৃদ্ধি করতে সচেষ্ট ছিলেন।

কনস্ট্যান্টাইন ছিলেন একজন বিচক্ষণ শাসক ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন রাজনীতিবিদ্। তাঁর রাজত্বকালে খ্রীস্টধর্মে বিশ্বাসীদের সংখ্যা প্রচুর বেড়ে গিয়েছিল এবং সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পায় খ্রীস্ট ধর্মাধিষ্ঠানের শক্তি। **সাম্রাজ্যের ঐক্যের খাতিরে এবং রাজশক্তিকে সুসংহত করবার জন্য তিনি খ্রীস্টধর্মকে স্বীকার করে নেন। ৩১৩ খ্রীস্টাব্দে মিলানের রাজাদেশে** খ্রীস্টানদের প্রতি সহনশীলতা অনুমোদন করা হয়। খ্রীস্টানদের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া হয়, রাজস্বের বিষয়ে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়, এবং ধর্মাধিষ্ঠানকে উদার হস্তে ভূমি দান করা হয়। **এই সময় থেকে খ্রীস্ট ধর্মাধিষ্ঠান হয়ে ওঠে রাজশক্তির এক বিশ্বস্ত মিত্র ও সমর্থক এবং সম্রাটরা হয়ে ওঠেন খ্রীস্ট ধর্মাধিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক।** সাম্রাজ্যের অপর সকল সংস্থার মত খ্রীস্টধর্ম সংস্থারও প্রধানরূপে কনস্ট্যান্টাইন নিজেকে প্রতিপন্ন করেন। খ্রীস্টধর্মের বিভিন্ন উপদলগুলোর মধ্যে মত বিরোধ দূর করবার জন্য ৩২৫ খ্রীস্টাব্দে কনস্টান্টাইন নিকাইয়াতে একটি ধর্মসভা আহ্বান করেন এবং এই সভায় সভাপতিত্ব করেন।

(খ) ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য গঠনে জাস্টিনিয়ানের প্রয়াস :

৩৯৫ খ্রীস্টাব্দে পূর্বাঞ্চলীয় ও পশ্চিমাঞ্চলীয় রোম সাম্রাজ্যে মধ্যে চূড়ান্ত বিচ্ছেদ ঘটে। পূর্বাঞ্চলীয় সাম্রাজ্য বা বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্য পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের তুলনায় অধিক গুরুত্ব অর্জন করে। ৪৭৬ খ্রীস্টাব্দে ওডোয়েকার যখন পশ্চিম রোম সম্রাট রোমুলাস অগাষ্টুলাসকে হত্যা করে রোম দখল করেন, তখন তিনি বাইজাণ্টাইন সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন। এরপর অন্যান্য জার্মান উপজাতীয় রাজারা,

যারা রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ দখল করেছিলেন, এবং রোমের বিশপগণও বাইজান্টাইন সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করেন। কিন্তু অপরদিকে রাজক্ষমতা, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও বাইজান্টাইন সম্রাটগণ পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের ওপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার বিশেষ চেষ্টা করেন নি।

এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে বাইজান্টাইন সম্রাট **জাস্টিনিয়ানের** রাজত্বকালে (৫২৭-৫৬৫ খ্রীস্টাব্দে)। জাস্টিনিয়ান ছিলেন একজন অতি দক্ষ রাজনীতিবিদ্ ও কূটনীতিবিদ্। তিনি প্রাচীন ঐক্যবদ্ধ

জাস্টিনিয়ান এবং তাঁর সভাসদগণ

রোম সাম্রাজ্যের গৌরব ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর প্রধান সহায় ছিলেন রাণী **থিয়োডোরা** এবং সেনাপতি **বেলিসেরিয়াস**।

সিংহাসনে আরোহণের কিছুকাল পরে, রাজধানী কনস্ট্যান্টিনোপলে জাস্টিনিয়ানের বিরুদ্ধে একটি বিরাট বিদ্রোহ দেখা দেয়। একে বলা হয় **'নিকা'** (জয় করা) বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহ দমনের পর তিনি সাম্রাজ্য জয় শুরু করেন। ভ্যাণ্ডালদের পরাজিত করে উত্তর আফ্রিকা তিনি দখল করেন। এরপর ইটালিতে তিনি পূর্বগথদের পরাজিত করে ইটালি পুনরুদ্ধার করেন। দক্ষিণ স্পেনের কিছু অংশ থেকে পশ্চিম

গথদের পরাজিত করে তিনি ঐ স্থানও পুনরাধিকার করেছিলেন। এইভাবে তিনি ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলকে তাঁর অধীনে ঐক্যবদ্ধ করে ব্যাপক বাণিজ্যিক যোগসূত্র স্থাপনের ও বাণিজ্য সম্প্রসারণের এবং সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের পথ প্রশস্ত করেন। জাস্টিনিয়ান পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য সম্পূর্ণ উদ্ধার করতে পারেননি সত্য, কিন্তু জার্মানীর বর্বরদের ওপর তিনি কঠোর প্রতিহিংসা নিয়েছিলেন। পশ্চিম জয়ে

তিনি এত মগ্ন ছিলেন যে, পূর্বদিকে পারসিকরা তাঁর সাম্রাজ্য ক্ষতবিক্ষত করে ফেলেছিল। ৫৩০ খ্রীস্টাব্দে বেলিসারিয়াস পারসিকদের পরাজিত করেন। কিন্তু সেই বিজয়ের ফল ছিল ক্ষণস্থায়ী। পারস্যরাজ খসরু দীর্ঘকাল ধরে বারবার আক্রমণ করে সিরিয়া দেশ বিধ্বস্ত করেন ও এ্যান্টিয়োক দখল করে নেন। পশ্চিমে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করার ফলে জাস্টিনিয়ানকে পারসিকদের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। তিনি প্রায় প্রত্যেকবারই পারসিকদের ধনরত্ন উপঢৌকন দিয়ে আক্রমণ থেকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করতেন।

জাস্টিনিয়ানের সামরিক সাফল্যের কারণ ছিলেন তাঁর সেনাপতি বেলিসারিয়াস। সম্রাট কিন্তু তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখতেন। ইতিহাসে বেলিসারিয়াসের মত সমর নায়ক বিরল। গৌরব ও

জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠেও তার ব্যবহার ছিল অতি সাধারণ লোকের মত।

জাস্টিনিয়ানের আইন সংহিতা এবং তার গুরুত্ব : জাস্টিনিয়ানের গৌরব ও কৃতিত্ব শুধুমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর এক মহান ও কালজয়ী কীর্তি হল **'করপাস জুরিস সিভিলিস'** বা দেওয়ানী আইন সংহিতা। জাস্টিনিয়ান যখন সম্রাট হন, তখন কোন সুসংবদ্ধ আইন বিধি ছিল না। এবং প্রচলিত আইনে নানা অসঙ্গতি ছিল। এই অবস্থার প্রতিকারকল্পে জাস্টিনিয়ান শত শত বছর ধরে রোমে যে আইনগুলির সৃষ্টি হয়েছিল ও রোমান জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল, সেগুলো সংগ্রহ করিয়ে, সাজিয়ে গুছিয়ে ঐ সংহিতা রচনা করান। এই আইনগুলো ছিল রোমান সভ্যতার এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। জাস্টিনিয়ান এই উদ্দেশ্যে আইন সংহিতা সঙ্কলন করেছিলেন, যেন যে কেউ আইনগুলো জানতে পারে, বুঝতে পারে এবং প্রয়োজনমত কাজে লাগাতে পারে। সংহিতাটি তিন ভাগে বিভক্ত--মূল সংহিতা বা **'কোড'** যার মধ্যে আছে সম্রাটদের সৃষ্ট আইনগুলি। **'ডাইজেষ্ট'** বা রোমের ব্যবহারজীবী ও আইনজ্ঞদের দ্বারা লিখিত আইনগুলির একটি সঙ্কলন ; এবং **'ইনষ্টিটিউট'** যাতে আছে রোমীয় আইন কিভাবে ও কেন রচিত হয়েছে তার ব্যাখ্যা। জাস্টিনিয়ানের সংহিতা ইউরোপের সমস্ত দেশের আইন রচনাকে প্রভাবিত করেছে এবং সম্ভবতঃ আজও আইনের এমন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি যা ঐ সংহিতার মতো অত বেশী ব্যবহৃত হয়। **রোমানগণ পৃথিবীকে আইন ব্যবস্থা উপহার দিয়েছে, এই উক্তির যথার্থতা প্রমাণ করে জাস্টিনিয়ানের আইন সংহিতা।**

স্থাপত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা : সম্রাট জাস্টিনিয়ান ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তাঁর স্থাপত্যানুরাগ ছিল অসাধারণ। সমগ্র কনস্ট্যান্টিনোপলে তিনি বহু রাস্তাঘাট, সেতু, কৃত্রিম জলপ্রণালী বাঁধ, প্রসাদ, গীর্জা, দুর্গ ইত্যাদি নির্মাণ করিয়েছিলেন। তাঁর রাজত্ব-কালে বাইজান্টাইন স্থাপত্য রীতি উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে। এই রীতি ছিল প্রাচীন ঐতিহ্য ও প্রাচ্যদেশীয় প্রভাবে প্রভাবিত।

জাস্টিনিয়ানের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত **বাইজান্টাইন স্থাপত্য রীতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল সেণ্টসোফিয়া গীর্জা।** সোনারূপোর কাজ

সেণ্টসোফিয়া গীর্জা

করা, রত্নখচিত, আলোক সজ্জিত এই গীর্জা ছিল এক আশ্চর্য ব্যাপার। এর নির্মাণ কৌশল ও কারুকার্য মানুষকে বিস্মিত করে।

বাইজান্টাইন স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য হল গম্বুজের আবিষ্কার বা। বৃত্তাকৃতি, বহুভুজ এমনকি চতুর্ভুজ নক্সার,—যা ভূমিকে ঢাকতে পারে। সর্বোপরি ছাদের বদলে একাধিক গম্বুজের সন্নিবেশ এর এক বিশেষ নিপুণতা। এই বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন হল সেণ্টসোফিয়া গীর্জা। সমস্ত গীর্জার বাড়িটি দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ২২৫ ফুট× ১০৭ ফুট জায়গা জুড়ে।
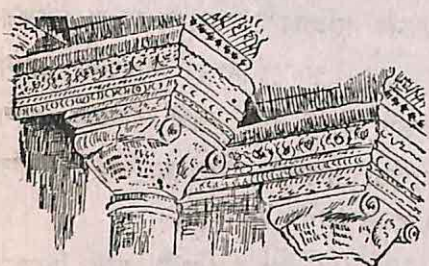
সেণ্টসোফিয়া গীর্জার দুটো থাম

জাস্টিনিয়ানের পৃষ্ঠপোষকতায় চিত্রশিল্পরীতিও উন্নতি লাভ করেছিল। বিভিন্ন অট্টালিকার ভেতরের দেওয়ালে মোজেক বা টুকরো পাথর দিয়ে

ছবি আঁকার রেওয়াজ ছিল। চক্‌চকে কাঁচের টুকরোও ব্যবহার করা হত। এ ধরনের মোজেক ছবির মধ্যে সম্রাজ্ঞী থিয়োডোরা ও তাঁর পার্ষদদের ছবি উল্লেখযোগ্য।

মোজেক চিত্র—বাইজাণ্টাইন শিল্পের নিদর্শন

মোজেক চিত্রশিল্পের প্রধান উপজীব্য ছিল ধর্মীয় বিষয়। সমগ্র বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যের বিভিন্ন ধর্ম সৌধে এধরনের ছবি ছিল। মোজেক ছবি দীর্ঘকাল ইওরোপের চিত্রশিল্পকে প্রভাবিত করে রেখেছিল।

(গ) ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল এবং সংস্কৃতির রক্ষকরূপে বাইজান্টিয়ামের গুরুত্ব :

প্রাচীন গ্রীক শহর বাইজান্টিয়ামকে যখন কনস্ট্যাণ্টাইন রোম সাম্রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত করেন তখন তার কয়েকটি উদ্দেশ্য ছিল। কনস্ট্যান্টিনোপল থেকে সমগ্র রোম সাম্রাজ্য শাসন করা অনেক সুবিধাজনক ছিল। এছাড়া শহরটির ভৌগোলিক অবস্থান তাকে শত্রুদের কাছে প্রায় দুর্ভেদ্য করে তুলেছিল। কনস্ট্যান্টিনোপল যতদিন শত্রুর আক্রমণ থেকে বেঁচে ছিল, বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যও ততদিন

বেঁচে ছিল। তাই কনস্ট্যান্টিনোপলের ইতিহাসই হচ্ছে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের ইতিহাস। সুরক্ষিত থাকার দরুণ বসফোরাস প্রণালীর তীরবর্তী কনস্ট্যান্টিনোপল শহর ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পকলার এক বিরাট কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। এছাড়া সিরিয়ার এ্যান্টিয়োক এবং মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া সাম্রাজ্যের ব্যাপক বাণিজ্যিক যোগসূত্র স্থাপনের ও রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারণের বিষয়টিকে সুনিশ্চিত করেছিল। বাই-জান্টিয়ামের অপর একটি বিশেষ সুবিধার বিষয় এই ছিল যে ইওরোপ ও পূর্বাঞ্চলীয় দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্যিক যোগসূত্র হিসাবে এর ভূমিকা। বাইজান্টিয়াম ছিল তৎকালীন পৃথিবীর ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। পৃথিবীর পূর্বদিকেই তখন ছিল সভ্যজাতিগুলোর অধিষ্ঠান। বাণিজ্যপথ ছিল লোহিত সাগর, আরব সাগর আর ভারত মহাসাগরের মধ্য দিয়ে। স্থলপথে মিশরের মধ্য দিয়ে ইথিওপিয়া, ভারত ও চীন প্রভৃতি দেশে ব্যবসা বাণিজ্য চলত। বাণিজ্যের উদ্দেশ্য ছিল বিলাসিতা ও জাঁকজমকের উপাদান সংগ্রহ করা। চীনের রেশম, ভারতের মশলা ও নানারকম বিলাসদ্রব্য, সিংহলের মুক্তা, লেবাননের দামী কাঠ এইসব ছিল প্রধান পণ্য। সম্রাট জাস্টিনিয়ান ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার সাধনে উৎসাহী ছিলেন। তাঁর আমলে ক্রিমিয়ার বন্দরগুলোতে বাণিজ্যের পরিমাণ বেড়ে যায়। রেশম উৎপাদন চীনের একচেটিয়া ব্যবসায় ছিল। কিন্তু দুজন ধর্মযাজক গোপনে রেশমের গুটিপোকা চীনদেশ থেকে নিয়ে আসেন এবং ৫৫৪ খ্রীস্টাব্দ থেকে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে রেশম উৎপাদন সুরু হয়।

বাইজান্টাইনের নাবিক ও বণিকেরা বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করবার ফলে, সেইসব দেশের জীবনযাত্রা, ভৌগোলিক বিবরণ ইত্যাদি সম্বন্ধে বহু তথ্য জানত। এইসব প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে বহু গ্রন্থাদি লেখা হয়েছিল।

বাইজান্টিয়াম ছিল মধ্যযুগে ইওরোপায় সংস্কৃতির রক্ষক। পশ্চিম ইওরোপের তুলনায় বাইজান্টিয়ামে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা ছিল বেশী। এখানে শিক্ষালাভকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত। ছাত্রদের প্রথমে

ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়া হত। তারপর প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য—বিশেষ করে হোমার, ডিমোস্থিনিস ইত্যাদি লেখকদের গ্রন্থাদি পড়ানো হত। অঙ্কশাস্ত্র, জ্যামিতি, সঙ্গীত, জ্যোতির্বিদ্যা, আইনশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, ভেষজবিদ্যা ইত্যাদিও পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ ছাড়া গীর্জার অধীনে ধর্মশাস্ত্র শিক্ষারও ব্যবস্থা ছিল। কনস্ট্যান্টিনোপল, এ্যান্টিয়োক, আলেকজান্দ্রিয়া, এথেন্স প্রভৃতি শহরে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। অবশ্য জাস্টিনিয়ানের রাজত্বকাল থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রাধান্য বেড়ে যায়। ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার স্থান গ্রহণ করে ধর্মীয় শিক্ষা। জাস্টিনিয়ানের সময় থেকেই ল্যাটিন ভাষার চেয়ে গ্রীক ভাষা ও সাহিত্যের চর্চাই প্রধান হয়ে ওঠে। এছাড়া হিব্রু ভাষার চর্চা হত। বাইজান্টিয়ামে দর্শনশাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য চর্চা হত। প্রাচীন গ্রীক দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা-ব্যবস্থার অঙ্গ ছিল। দার্শনিক লিও ছিলেন একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত। বাইজাণ্টাইন পণ্ডিতরা প্রাচীন গ্রীক অঙ্কশাস্ত্র ও জ্যামিতিশাস্ত্রের চর্চা করতেন। রসায়নশাস্ত্রে বাইজাণ্টাইন পণ্ডিতদের উল্লেখযোগ্য অবদান 'গ্রীক ফায়ার' নামে একপ্রকার তরল আগুন আবিষ্কারে। এই তরল আগুন যুদ্ধে ব্যবহার করা হত। এছাড়া যন্ত্রবিদ্যা ও স্থাপত্যবিদ্যায় তাঁরা পারদর্শী ছিলেন। কলের ঘড়ি তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন। চিকিৎসাবিদ্যায়ও তাঁরা পারদর্শী ছিলেন। ভেষজবিদগণ স্বাস্থ্য সম্মত খাদ্য তালিকা প্রণয়ন করেছিলেন। সমগ্র সাম্রাজ্যে বহু হাসপাতাল ছিল।

অনুশীলনী

১। কনস্ট্যান্টিনোপল কে প্রতিষ্ঠা করেন এবং কেন?

২। খ্রীস্টধর্মকে কনস্ট্যাণ্টাইন কেন রাজধর্মে পরিণত করেন?

৩। সম্রাট জাষ্টিনিয়ান কিভাবে রোম সাম্রাজ্যকে ঐক্যবদ্ধ করতে চেষ্টা করেছিলেন?

৪। জাষ্টিনিয়ানের আইন সংহিতা কাকে বলে? এর গুরুত্ব কি?

৫। শিল্প ও বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থলরূপে বাইজান্টিয়ামের গুরুত্ব কি ছিল?

৬। **কম কথায় উত্তর দাও:**

(ক) জাস্টিনিয়ানের সেনাপতি কে ছিলেন?

(খ) জাস্টিনিয়ানের আইন সংহিতা কি নামে পরিচিত? কি কি অংশে বিভক্ত?

(গ) বাইজান্টাইন স্থাপত্য রীতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কি?

(ঘ) মধ্যযুগে বাইজান্টিয়ামে কি কি শিক্ষা দেওয়া হত?

৭। **শূন্যস্থান পূরণ কর:**

(ক) মিলানের রাজাদেশে খ্রীস্টানদের প্রতি — অনুমোদন করা হয়।

(খ) — নিকাইয়াতে একটি — আহ্বান করেন।

(গ) রোমানগণ পৃথিবীকে — উপহার দিয়েছে, এ উক্তির যথার্থ প্রমাণ করে — —।

৮। **টীকা লেখ:**

(ক) কনস্ট্যান্টাইন, (খ) নিকা, (গ) সেন্টসোফিয়া, (ঘ) মোজেক চিত্র, (ঙ) গ্রীক ফায়ার।

৯। **সঠিক উত্তরটির নীচে দাগ দাও:**

(ক) কনস্ট্যান্টিনোপল প্রতিষ্ঠা করেন (জাস্টিনিয়ান, থিয়োডোরা, কনস্ট্যানটাইন)

(খ) বাইজান্টাইন স্থাপত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল (মোজেক চিত্র সেন্টসোফিয়া গীর্জা, গ্রীক ফায়ার)

১০। **ঠিক উত্তরটির পাশে (✓) চিহ্ন এবং ভুল উত্তরের পাশে (×) চিহ্ন দাও:**

(ক) জাস্টিনিয়ানের প্রধান সহায় ছিলেন তাঁর রাণী এবং সেনাপতি।

(খ) কনস্ট্যানন্টাইনের নামে কনস্ট্যান্টিনোপল প্রতিষ্ঠিত হয়।

(গ) জাস্টিনিয়ানের আইন সংহিতা গ্রীক সভ্যতার এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

(ঘ) মোজেক চিত্রশিল্পের প্রধান উপজীব্য ছিল ধর্মীয় বিষয়।

(ঙ) ল্যাটিন আধুনিক ইউরোপীয় ভাষার অন্যতম।

(চ) গ্রীক সাহিত্যে হোমার, ডিমোস্থিনিসের অবদান স্মরণীয়।

পঞ্চম অধ্যায়

॥ ইসলাম ধর্ম ও তার প্রভাব ॥
(Islam and its impact)

আরবদেশ ও তার অধিবাসীরা (The Arabs—land and people) :

এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত মরুময় আরবদেশ। দেশটি তিনদিকে জল বেষ্টিত। এজন্য একে বলা হয় আরব উপদ্বীপ। এর পশ্চিমে লোহিত সাগর, পূর্বে পারস্য উপসাগর ও ওমান উপসাগর এবং দক্ষিণে এডেন উপসাগর ও আরব সাগর। আরব উপদ্বীপের প্রায় সমগ্র অঞ্চল মালভূমি এবং পশ্চিম থেকে পূর্বে ক্রমশ ঢালু।

এখানকার জলবায়ু এত শুকনো যে এখানে কোন নদী বা ক্ষীণ জলধারাও নেই। দক্ষিণের একটি বিরাট অঞ্চল জলহীন মরুভূমি। মধ্য আরবের কিছু কিছু জায়গায় মরুদ্যান অঞ্চলে জল পাওয়া যায়। এখানকার জলবায়ু উষ্ণ ও শুষ্ক এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নগণ্য।

আরব দেশের চারদিকে ছড়িয়ে ছিল বহু প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্র, গড়ে উঠেছিল বহু প্রাচীন সাম্রাজ্য— মিশর, আসিরিয়া, পারস্য, গ্রীক ও রোম সাম্রাজ্য—সবই ছিল আরবের প্রতিবেশী। কিন্তু এইসব প্রাচীন সাম্রাজ্যগুলির দ্বারা আরবদেশ কখনো অধিকৃত হয়নি। লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরের উপকূলে অবস্থিত কয়েকটি স্থানের ওপরে ছাড়া প্রতিবেশী প্রাচীন সভ্যতাগুলোর কোন প্রভাব আরবদেশের ওপর পড়ে নি। এর কারণ আরবদেশের প্রাকৃতিক গঠন ও মরুময়তা। আরব শব্দের অর্থ শুষ্ক।

প্রাচীনকালে আরবদেশে কোন রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। আরবরা বহু উপজাতিতে বিভক্ত ছিল। প্রতি উপজাতির একজন নেতা বা প্রধান থাকত। তাদের বলা হত শেখ। সমগ্র উপজাতিকে তারাই নিয়ন্ত্রণ করতেন। শেখ ও নিকট আত্মীয়স্বজনরাই ছিলেন অভিজাত সম্প্রদায়। তাদের ব্যক্তিগত পশু সম্পদ ছিল অনেক বেশী। শ্রেষ্ঠ চারণভূমি ছিল তাদের দখলে। যুদ্ধবন্দীরা ক্রীতদাসরূপে তাদের অধীনে থাকত। তাদের কাজ ছিল কূপ খনন করা, পশুচারণা ইত্যাদি। আরবরা দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল— সারবাণী ও বেদুইন বা মরুবাসী। ঘোড়া এবং উটই ছিল প্রধান বাহন। বেদুইনরা ছিল যাযাবর। উট, ছাগল, ঘোড়া প্রভৃতি পালিত পশু নিয়ে মরুভূমির মাঝে দলবেধে তারা ঘুরে বেড়াত চারণভূমির খোঁজে। কিছুকাল তাবু ফেলে এক জায়গায় থাকত, আবার অন্য কোথাও চলে যেত। পশু পালন ও লুটপাটই ছিল তাদের উপজীবিকা। এরা অতিশয় দারিদ্র জীবনযাপন করত। খাদ্যের মধ্যে প্রধান ছিল খেজুর আর পশুর মাংস। মরূদ্যান অঞ্চলে কিছু আরব স্থায়ীভাবে বাস করত। এদের উপজীবিকা ছিল কৃষি ও বাণিজ্য। বিভিন্ন আরব উপজাতির মধ্যে অবিরাম যুদ্ধ বিগ্রহ চলত। যুদ্ধ হত সাধারণতঃ জলের কূয়ো, মরূদ্যান, ভেড়া, উট অর্থাৎ জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুগুলোর অধিকার নিয়ে। মরুদেশের কঠিন জীবনযাত্রার ফলে আরবরা গড়ে উঠেছিল এক স্বাধীনতা

প্রিয়, সাহসী কষ্টসহিষ্ণু ও যুদ্ধনিপুণ জাতিরূপে। তাদের আত্মমর্যাদাবোধ ছিল প্রখর।

মূর্তি পূজো ছিল তাদের ধর্ম। প্রত্যেক উপজাতি নিজ নিজ পদ্ধতি অনুযায়ী আপন আপন দেবতার পুজো করন। হিন্দুদের কাশী ও খ্রীষ্টানদের রোমের মত, মক্কা ছিল তাদের পুণ্য তীর্থক্ষেত্র। মক্কার কাবা মন্দিরে ৩৬০টি দেবদেবীর মূর্তি ছিল। আরবরা সেইসব মূর্তি পূজা করত। 'কাবা' শব্দের' অর্থ চৌকো জিনিষ। পাথরের তৈরী কাবা মন্দিরে ছিল একটি কাল পাথর, যাকে বিভিন্ন আরব উপজাতিগুলো আপন আপন উপজাতীয় দেবদেবীর ওপরে প্রধান দেবতারূপে মানত। মক্কা ছিল সমগ্র আরব জাতির কাছে এক পরম পুণ্যক্ষেত্র। ক্রমাগত যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকলেও আরবরা পবিত্র বসন্তকালে চারমাস সব শত্রুতা ভুলে যেত, জড় হত এসে মক্কার মেলায়, আর সেখানে পুজো দিত কাবা মন্দিরে।

বহু প্রাচীনকাল থেকে আরবরা ব্যবসা-বাণিজ্য করত। মক্কা শহর জাতীয় মিলন ক্ষেত্র রূপে একটি বড় ব্যবসা-কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। অতিথি-পরায়ণতার জন্য আরবরা ছিল বিখ্যাত, এদের মধ্যে পুরুষরা বহু বিবাহ করত। বেশির ভাগ আরব অধিবাসী নিরক্ষর হলেও গান ও কবিতা ছিল তাদের জীবনের একটি বড় আকর্ষণ। আরব কবিরা বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করে কবিতার মাধ্যমে শোনাতেন জাতীয় ইতিহাস, বিভিন্ন খবর প্রচার করতেন উপদেশ বা যুদ্ধের আহ্বান। বিভিন্ন উপজাতির কবিরা প্রতি বছর একটি কবিতা প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতেন। প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ কবিতাটিকে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখা হত এবং সেটিকে বলা হত সোনার গান।

ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মহম্মদ ও তাঁর শিক্ষা (The Prophet and his teachings) :

এই আরবদেশের মক্কা শহরে ৫৭০ খ্রীস্টাব্দে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মহম্মদের জন্ম হয়। মহম্মদের আসল নাম ছিল আবুল করিজন। মহম্মদের বাবার নাম ছিল আবদুল্লা ও মার নাম আমিনা। মহম্মদের

জন্মের মাত্র কয়েকদিন আগে আবদুল্লা মারা যান। মাত্র ছ'বছর বয়সে মহম্মদ মাকেও হারান। যদিও তিনি আরবদেশের সম্ভ্রান্ত কোরেশি উপজাতির অন্তর্গত এক পরিবারের সন্তান ছিলেন, তবু তিনি নিজে ছিলেন খুবই গরীব। পিতামাতার মৃত্যুর পর পিতামহ আবদুল মুতালিব তাঁর প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করেন। তার মৃত্যুর পর মহম্মদের পিতৃব্য আবু তালিবের কাছে প্রতিপালিত হন। কোমল স্বভাব ও মিষ্টভাষী মহম্মদ পরের দুঃখকষ্টে সহজেই ব্যথিত হতেন। দারিদ্র্যের জন্য শৈশবে তাঁকে পরিবারের অন্য সকলের মত পশু চরাতে হত। হয়ত তিনি সামান্যভাবে ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যখন তাঁর বয়স ২৫ বছর, খাদিজা নামে কেরেশি উপজাতির এক ধনী বিধবা তাঁকে আপন ব্যবসায়ে নিযুক্ত করেন। কিছুদিন পরে তিনি খাদিজাকে বিবাহ করেন। ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত মহম্মদ মক্কার একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীরূপে পরিচিত ছিলেন। তারপর ক্রমশ তাঁর মনে গভীর ধর্মভাবের উদয় হয়। ৬১০ খ্রীস্টাব্দে তিনি একদিন রাত্রে এক পর্ব্বতের গুহায় ঈশ্বরের বাণী শুনতে পান। তিনি শুনতে পান যে, আল্লা তাঁকে বলছেন, তিনিই পৃথিবীতে আল্লার দূত। তাঁর এই ঐশ্বরিক অভিজ্ঞতার কথা তিনি খাদিজার কাছে প্রকাশ করেন। খাদিজাও তাঁকে উৎসাহিত করেন এবং আল্লার দূতরূপে পৃথিবীতে তাঁর বাণী প্রচার করতে বলেন। **মহম্মদ তখন নিজেকে আল্লার দূত রূপে প্রচার করেন। যে ধর্ম তিনি প্রচার করেন তাকে বলে ইসলাম বা মুসলমান ধর্ম।** সম্ভবত তিনি নিরক্ষর ছিলেন। তাঁর বাণী ও উপদেশ তাঁর সহযোগীরা লিপিবদ্ধ করে রাখেন। পরে তা **মুসলমানদের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ কোরান** রূপে প্রকাশিত হয়।

কোরান শব্দের অর্থ গ্রন্থ—ধর্মের নীতিসম্বলিত গ্রন্থ। কোরান পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ। **ইসলামধর্ম অনুযায়ী আল্লা হচ্ছেন একমাত্র ঈশ্বর এবং মহম্মদ তাঁর দূত** ('লা আল্লাহ্ ইল্লাল্লাহ্ মহম্মদর্ রসুলাল্লাহ্')। পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষের জন্য ইসলামের দ্বার উন্মুক্ত। **ইসলাম ধর্মবিশ্বাসীর পাঁচটি প্রাথমিক কর্ত্তব্য** আছে—তাকে

এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে হবে, প্রতিদিন পাঁচবার প্রার্থনা করতে হবে, দান করতে হবে, উপবাস বিধি বা রমজান পালন করতে হবে এবং অন্তত একবার মক্কায় তীর্থযাত্রা করতে হবে। এই পাঁচটি বিধিকে বলা হয় ইসলামের মূল কথা। ইসলাম মানুষকে শিক্ষা দেয় যে, সব মানুষ সমান ও পরস্পরের ভাই। ইসলামে মাদক দ্রব্য গ্রহণ নিষিদ্ধ। নারী জাতির অবরোধ প্রথার কথা এতে বলা হয়েছে। খ্রীস্টধর্মের মত ইসলাম ধর্মও পারলৌকিক জীবনে বিশ্বাস করে। ইহলোকে পাপ পুণ্যের প্রতিফল স্বর্গরাজ্যে পাওয়া যায় এবং ইসলামে অবিশ্বাসীর জন্য নরক যন্ত্রণা অপেক্ষা করছে—এই বিশ্বাস ইসলাম ধর্মে রয়েছে।

মহম্মদের নতুন ধর্ম প্রথমে গ্রহণ করেন, তাঁর স্ত্রী খাদিজা, বন্ধু আবু বকর, পিতৃব্যপুত্র আলি, ভৃত্য জাইদ্, ওমর, হামজা ও ওসমান। ইসলাম প্রচারে নেমে মহম্মদকে বহু বিপদের সম্মূখীন হতে হয়। মক্কাবাসীরা তাঁর নতুন ধর্ম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এবং তাঁকে নির্যাতন শুরু করে। প্রতিবেশী রাজ্য ইয়াথ্রেবের অধিবাসীরা কিন্তু তাঁর ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। মক্কা ও ইয়াথ্রেবের মধ্যে শত্রুতা ছিল। নির্যাতিত মহম্মদকে ইয়াথ্রেববাসীরা আশ্রয় দিতে রাজী হয়। মক্কাবাসীরা এই কথা জানতে পেরে মহম্মদকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত হল। মহম্মদ তখন গোপনে ইয়াথ্রেবে পালিয়ে যান (৬২২ খ্রীস্টাব্দে)। মহম্মদের এই পলায়নকে বলে **হিজরা**। এই **হিজরা থেকেই মুসলমানদের সন তারিখ হিসেব করা হয়**। ইয়েথ্রেবের অধিবাসীরা মহম্মদকে সাদরে গ্রহণ করে। সেই থেকে ইয়াথ্রেবের নাম হয় **মদিনা** অর্থাৎ নব বা ধর্মগুরুর নগর। হিজরার পর থেকে মহম্মদের ভাগ্য পরিবর্তন হয়। আট বছর মদিনায় থাকার পর তিনি শত্রুদের পরাজিত করে আবার মক্কায় ফিরে আসেন। তারপর তিনি সমগ্র আরবদেশের ধর্মগুরু ও নেতারূপে স্বীকৃত হন। শত্রুদের প্রতি তিনি খুব সদয় ব্যবহার করতেন। পরম গৌরবের মধ্যে ৬৩২ খ্রীস্টাব্দের ৮ই জুন, প্রার্থনারত অবস্থায় মহম্মদ দেহত্যাগ করেন।

ইসলামের প্রসার সাধনের বিভিন্ন কারণ (Factors which facilitated the spread of Islam) :

মৃত্যুর আগে মহম্মদ ঘোষণা করেছিলেন যে, ইসলামের বাণী পৃথিবীর অন্যান্য দেশে প্রচারিত হোক। তাঁর মৃত্যুর ৫০ বছরের মধ্যে ইসলাম মিশর ও পারস্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ১০০ বছরের মধ্যে তা পূর্বে ভারতবর্ষ ও পশ্চিমে স্পেন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। **ইসলাম ধর্মের দ্রুত প্রসার সাধনের কয়েকটি কারণ ছিল।** ইসলাম ধর্ম ছিল সহজ, সরল একটি মতবাদ। আড়ম্বরবহুল বাহ্যিক অনুষ্ঠানবর্জিত। পুরোহিত শ্রেণীর কোন স্থান এতে ছিল না। ইসলামের নৈতিক আদর্শ, ভ্রাতৃত্ববোধ, একেশ্বরবাদ, গরীবদের প্রতি বাধ্যতামূলক দান, মদ্যপান নিরোধ প্রভৃতি বিচ্ছিন্ন আরব উপজাতিগুলোকে দ্রুত সংগঠিত করে তোলে এবং তাদের মধ্যে এক নতুন প্রাণের সঞ্চার করে। দুর্দান্ত, বর্বর, যুধ্যমান বিভিন্ন উপজাতিগুলো এই নবধর্মের প্রভাবে একটি বিরাট ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত হয়। ধর্মীয় ঐক্যের ফলে বিচ্ছিন্ন আরব উপজাতিগুলো একটি ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়। প্রতিবেশী দেশগুলোতে সামরিক শক্তির প্রয়োগে ইসলাম ধর্ম প্রচারের প্রবণতা দেখা যায়। আরব যাযাবররা পেশাদার যোদ্ধায় পরিণত হয়। পারিশ্রমিকরূপে তারা যুদ্ধে লুণ্ঠিত দ্রব্যের অংশ লাভ করত। এই প্রথা আরব সৈন্যদলের দীর্ঘকাল ধরে অবিরাম যুদ্ধ করার আগ্রহ বাড়িয়ে তোলে। ফলে ইসলামের দ্রুত প্রসার ঘটে।

খলিফাগণ ও আরব সাম্রাজ্য (The Chaliphs, the Arab Empire) :

মহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁর শ্বশুর ও অন্যতম প্রধান শিষ্য আবু বকর পরবর্তী ধর্ম নেতা বা খলিফা নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন সরল, অনাড়ম্বর, ধর্মপ্রাণ ও ইসলামের উৎসাহী প্রচারক। পরবর্তী খলিফা ছিলেন ওমর। তাঁর আমলেই আরব সাম্রাজ্য বিস্তার শুরু হয়। সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, ইউফ্রেটিস উপত্যকা, ব্যাবিলন, আসিরিয়া, পারস্য, মিশর প্রভৃতি অঞ্চল তাঁর আমলে জয় করা হয়। ওমরের

পর খলিথা হন যথাক্রমে ওসমান ও আলি। আলি ছিলেন মহম্মদের খুড়তুতো ভাই এবং জামাতা তাঁর সময় থেকে খলিফা পদ নিয়ে আরবদের মধ্যে দলাদলি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। সিরিয়ার শাসক মুয়াইয়া ছিলেন আলির প্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর চক্রান্তে আলি নিহত হন। জ্ঞানে, নিষ্ঠায়, সাহসে, বীরত্বে ও মহত্ত্বে আলি ছিলেন সম্ভবতঃ শ্রেষ্ঠ খলিফা।

আলির মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হাসান খলিফা নির্বাচিত হন। কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই মুয়াইয়া তাঁকে পদচ্যুত করেন, পরে তাঁকে হত্যা করা হয়। মুয়াইয়া খলিফা পদ দখল করে এক নতুন খলিফা

আরব সাম্রাজ্য (৭৫০ খৃষ্টাব্দ)

বংশের সূচনা করেন। এই বংশকে বলা হয় ওমায়া বংশ। এই বংশের রাজত্বকালে আরবরা সমগ্র উত্তর আফ্রিকা ও স্পেন জয় করে। কিন্তু ফ্রান্স আক্রমণ করে আরবরা ৭৩২ খ্রীস্টাব্দে টুয়রস এর যুদ্ধে ফ্রাঙ্ক নেতা চার্লস মার্টেল এর হাতে পরাজিত হয়। এই পরাজয়ের ফলে পশ্চিম ইওরোপে আরব সাম্রাজ্য ও ইসলাম ধর্ম বিস্তার ব্যাহত হয়। এই

সময়েই আরব সাম্রাজ্য ট্রান্স ককেশিয়া, উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষ ও মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল।

৭৫০ খ্রীস্টাব্দে মহম্মদের এক পিতৃব্য আব্বাসের বংশধর খলিফা পদ অধিকার করেন। পূর্বপুরুষ আব্বাসের নামানুসারে নতুন খলিফা বংশের নাম হয় আব্বাসীয় বংশ। এই বংশের পঞ্চম খলিফা **হারুন-অল-রসিদ ছিলেন শ্রেষ্ঠ আব্বাসীয় খলিফা।** তিনি ছিলেন প্রজাকল্যাণকামী, ধর্মভীরু, মিতাচারী, কর্তব্যপরায়ণ কিন্তু আড়ম্বরপ্রিয়। তিনি ছিলেন একাধারে নিপুণ যোদ্ধা, কবি ও সুপণ্ডিত। বহু পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, কবি, গায়ক তাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত করত। কনস্ট্যান্টিনোপলের রাণী আইরীণ ও সম্রাট শার্লেমান
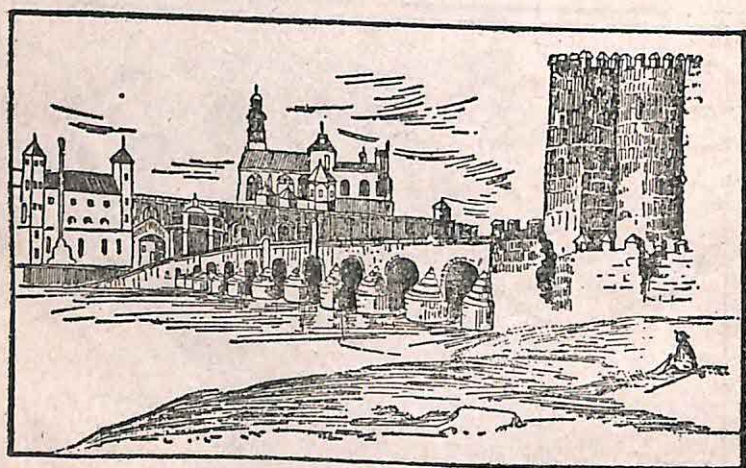
কর্ডোভার সেতু—মুরদের অমর কীর্তি

তাঁর সমসাময়িক ছিলেন। কিন্তু ঐশ্বর্য ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষে তিনি তাঁদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

ভারতের সিন্ধুঅঞ্চল, বেলুচিস্থান, তুর্কীস্থান, পারস্য, মেসোপটেমিয়া, আর্মেনিয়া, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, সাইপ্রাস, ক্রীট, মিশর ও উত্তর আফ্রিকা নিয়ে আব্বাসীয় সাম্রাজ্য গঠিত ছিল। রাজধানী ছিল বাগদাদ।

কর্ডোভা : (Cordova) আরবরা স্পেনের গথ শাসনের

অবসান ঘটিয়ে প্রতিষ্ঠা করে এক বিরাট সভ্যতার। স্পেনের আরবদের বলা হয় মুর। তাদের রাজধানী ছিল কর্ডোভা। স্পেনের আরব শাসকরা ছিল উদার উন্নত চরিত্রের। শিল্প, বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিদ্যা, আইন, দর্শন, গণিত ও কারিগরী বিদ্যায় স্পেনীয় আরবরা বিস্ময়কর উন্নতি করেছিল। কর্ডোভা ছিল সমসাময়িক ইওরোপের সবচেয়ে উন্নত শহর। এই শহরের ৩০০ স্নান বাপী, ৪০০ মসজিদ, রাত্রিকালে আলোকিত করার ব্যবস্থা সহ পাথর বাঁধানো প্রশস্ত রাজপথ, সেতু, ফোয়ারা শোভিত মনোরম উদ্যান প্রভৃতি আরব সভ্যতার উৎকর্ষের পরিচয় দিত। কর্ডোভার জনসংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচ লক্ষ। এই শহরটি ছিল শিল্প ও সংস্কৃতির একটি কেন্দ্রস্থল। হাতীর দাঁত, কাঁচ ও চর্মশিল্প ছিল খুব উন্নত। কর্ডোভায় ৭০টি গ্রন্থাগার ও একটি বিশ্ববিদ্যালয় ও অসংখ্য অবৈতনিক বিদ্যালয় ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয় ছিল খুব বিখ্যাত। বহু খ্রীস্টান ছাত্রও এখানে শিক্ষালাভ করত। এখানকার খ্রীস্টান ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন গেরবার্ট। তিনি পরবর্তীকালে পোপ দ্বিতীয় সিলভেষ্টার হয়েছিলেন। ইওরোপে গণিত শাস্ত্র প্রচলনে তাঁর উৎসাহ ছিল অসীম। কর্ডোভার শিল্পীদের একটি উল্লেখযোগ্য অবদান এ্যারাবেস্ক (আরবীয়) ললিতকলা। মুসলমান চারুশিল্পে মানুষ বা জীবজন্তুর মূর্তি রচনা নিষিদ্ধ থাকাতে, আরব শিল্পীরা এক নতুন শিল্পধারার প্রবর্তন করেন। তাঁরা পাতা, ফুল, রেখা, জ্যামিতিক গঠন প্রভৃতিকে নানা ভঙ্গিতে সন্নিবিষ্ট করেন। এই ভাবে এক মনোহারী শিল্পরীতির সৃষ্টি হয়।

একটি সুরম্য বাতিদান

ইসলামের কৃতিত্বে ইওরোপের প্রতিক্রিয়া (How Europe reacted to the achievements of Islam) :

আরব সাম্রাজ্যের অপ্রতিহত শক্তি ও দ্রুত সাম্রাজ্য বিস্তার

খ্রীস্টধর্মাবলম্বী ইওরোপের অস্তিত্বের পক্ষে সংকটজনক ছিল। ইওরোপের পূর্বাংশে বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্য, জাষ্টিনিয়ানের মৃত্যুর পর দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ফলে সপ্তম শতাব্দীতে বিজয়ী আরব বাহিনী বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশ দখল করতে শুরু করে। কনস্ট্যান্টিনোপল ছিল খ্রীস্টান সভ্যতার কেন্দ্রস্থল। তাই আরবদের উদ্দেশ্য ছিল কনস্ট্যান্টিনোপল দখল করা। কিন্তু ৭১৭ খ্রীস্টাব্দে তৃতীয় লিও বাইজাণ্টাইন সিংহাসনে আরোহণ করলে আরবদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। তৃতীয় লিও বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যের লুপ্ত গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ৭১৭-১৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি আরবদের কনস্ট্যান্টিনোপল দখলের চেষ্টা ব্যাহত করেন। তিনি যদি ব্যর্থ হতেন তবে আরব সভ্যতা বিদ্যুৎ বেগে সমগ্র পূর্ব ইওরোপে ছড়িয়ে পড়ত। কিন্তু তৃতীয় লিও ইওরোপীয় সভ্যতাকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

পশ্চিম ইওরোপে আরব আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য কোন ঐক্যবদ্ধ শক্তি ছিল না। ইতালি ছিল বহুধা বিভক্ত ও দরিদ্র। স্পেনের শুধুমাত্র উত্তরাংশে ভিসিগথ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। ফ্রান্সের ফ্রাঙ্ক অভিজাতরা আভ্যন্তরীণ দলাদলিতে লিপ্ত ছিল। আরবরা ভূমধ্যসাগরে প্রাধান্য বিস্তার করলে পশ্চিম ইওরোপের অর্থ নৈতিক জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হল। ফলে, সমাজজীবনে অব্যবস্থা ও সামরিক দুর্বলতা দেখা দিল। ফলে, আরববাহিনী সহজেই পশ্চিম ভূমধ্য-সাগরীয় অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তার করে এবং জিব্রাল্টার ও স্পেন দখল করে। কিন্তু ৭৩২ খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্স আক্রমণ করতে গিয়ে তারা পরাজিত হয়। চার্লস মার্টেল টুয়র্‌স্‌-এর যুদ্ধে তাদের পরাজিত করেন। এই যুদ্ধে আরব মুসলমানরা পরাজিত না হইলে বোধহয় সমগ্র ইওরোপে মুসলমান ধর্ম ও শাসন বিস্তৃত হত।

ইওরোপে রাজনৈতিক প্রভুত্ব ও ধর্ম বিস্তার করতে না পারলেও, আরবরা জ্ঞান বিজ্ঞানে, দার্শনিক চিন্তায়, কারিগরী বিদ্যায় ইওরোপকে উন্নত করেছিলেন। প্রাচ্যদেশীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান আরব মনীষীরা

বাঁচিয়ে রেখেছিলেন ও সমৃদ্ধ করে ইওরোপকে দান করেছিলেন। ফলে পরবর্তীকালে ইওরোপীয় সভ্যতা ঐশ্বর্যশালী হয়ে ওঠে।

সংস্কৃতি, শিল্পকলা, বিজ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে আরবদের অবদান ; কয়েকজন আরব পণ্ডিত (Arab Contributions to culture, arts and sciences, scholarship ; Some scholars) :

মানব সভ্যতার ইতিহাসে আরবদের দান অসীম। মধ্যযুগের অজ্ঞানতার অন্ধকারে আরবরাই জ্ঞানের শিখা অনির্বাণ রেখেছিলেন। যে সব জ্ঞান বিজ্ঞানের ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছিল গ্রীস, পারস্য ও অন্যান্য প্রাচীন প্রাচ্য সভ্যতার কেন্দ্রগুলোতে, তাকে আরব মনীষীরা শুধু বাঁচিয়েই রাখেন নি, সমৃদ্ধও করেছিলেন। গ্রীক বিজ্ঞান, পারসিক দর্শন, হিন্দু গণিত—এ সবের সমন্বয়ে তাঁরা এক অভিনব চিন্তাধারার প্রবর্তন করেন। অন্যের কাছ থেকে তাঁরা যা গ্রহণ করেছিলেন, তার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছিলেন নিজেদের চিন্তা ও আবিষ্কার। প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানকে তাঁরা এইভাবে আপন প্রতিভায় সমৃদ্ধ করে মানব জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। প্রাচীন গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞান শিক্ষা ও চর্চা করবার জন্য আব্বাসীয় খলিফা আল মামুন ৮১০ খ্রীস্টাব্দে **বায়ত-আল-হিকমা** (জ্ঞানের আগার) নামে বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠানে ছিল একটি বিরাট গ্রন্থাগার ও নানা শাস্ত্র চর্চার ব্যবস্থা। আর ছিল একটি অনুবাদ বিভাগ। এই বিভাগের কাজ ছিল প্রাচীন গ্রীক শাস্ত্রগুলো অনুবাদ করা।

অষ্টম থেকে একাদশ শতাব্দী আরব **সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ** ছিল। আরব কবিদের মধ্যে **আবু নুয়াস, আল, মুতানাবি** প্রভৃতি ছিলেন বিখ্যাত। আরবী গদ্যে যে সব রোমান্স লেখা হয়েছিল তার মধ্যে **'সহস্র-এক রজনী'** সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থের জনপ্রিয়তা সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। এর কাহিনীগুলোর মধ্যে নাবিক সিন্ধবাদ, আলিবাবা ও চল্লিশ চোর, আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ অন্যতম। আরব বণিকেরা বাণিজ্যের জন্য যে সব দেশ পরিভ্রমণ

করত, সেসব দেশের গল্প কাহিনীও এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। ধর্মীয় প্রভাব থাকলেও আরবীয় দর্শনে যুক্তিবাদী দিকগুলোও দেখা যায়। দর্শন শাস্ত্রে **ঘজালির** নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অনুবাদকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন **হুনায়িন-ইবন্ ইসাক**। তিনি ছিলেন একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত।

আরব বিজ্ঞানীরা বলতেন, 'জ্ঞান হচ্ছে মানুষের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার'। গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, ভূগোল ও ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য সাফল্য আরবরা অর্জন করেছিলেন। আধুনিক বীজগণিত আরবদের সৃষ্টি। শূন্য সংখ্যা ও দশমিকের ব্যবহার তাঁরা ভারত থেকে ইওরোপে প্রচার করেন। আরব বিজ্ঞানীরা দোলক বা পেণ্ডুলাম আবিষ্কার করেছিলেন। আরব জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জটিল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতেন। পৃথিবীর আনুমানিক আয়তন তাঁরা হিসেব করতে পেরেছিলেন। আরব বণিক ও পর্যটকগণ ভৌগোলিক জ্ঞান বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছিলেন। সমগ্র খলিফা সাম্রাজ্য, ভারত, চীনদেশ, পূর্ব-ইওরোপ ইত্যাদি স্থানের জল ও স্থলপথের মানচিত্র তারা তৈরী করেছিলেন। চিকিৎসা শাস্ত্রে ও ভেষজ বিজ্ঞানে আরবগণ বিস্ময়কর উন্নতি করেছিলেন। তাঁরা শরীর ও স্বাস্থ্যবিদ্যা চর্চা করতেন। শল্য চিকিৎসা ও আয়ুর্বেদ পদ্ধতিও তাঁরা জানতেন। ইওরোপে যখন ধর্মীয় অনুশাসনে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার প্রসার লোপ পেয়েছিল, চিকিৎসার নামে ভেলকি ও ডাকিনীবিদ্যা চলত, সেই সময় আরবদের বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসা পদ্ধতি ছিল। চীনদেশে আবিষ্কৃত কাগজ, বারুদ, দিগ্‌দর্শন যন্ত্র প্রভৃতির ব্যবহারও আরবরা করতেন। ৭৪৯ খ্রীস্টাব্দে আরবরা বাগদাদে কাগজ তৈরীর কারখানা বসান।

আরব মনীষীদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছিলেন **ইবন্ সিনা** বা **অভিসেন্না**। তিনি ছিলেন মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও দার্শনিক। একাদশ শতাব্দীতে মধ্য এশিয়ায় তিনি বাস করতেন। তিনিই প্রথম হাম ও বসন্ত রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে নিখুঁতভাবে অনুসন্ধান করেন। তাঁর দার্শনিক রচনার মধ্যে 'আশ-শিফা' এবং

'কিতাব-অল-ইনসাফ' প্রসিদ্ধ। তাঁর রচিত 'অল-কানন-ফিল তিব' (চিকিৎসা পদ্ধতি) একমাত্র প্রামাণ্য চিকিৎসা-গ্রন্থ রূপে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত সমাদৃত ছিল। শতাধিক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের তিনি রচয়িতা ছিলেন।

আবু রায়হান মুহম্মদ বিন আহম্মদ পরিচিত ছিলেন **আল বিরুণী** নামে। তিনি ছিলেন একাধারে দার্শনিক, ভূবিজ্ঞানী, গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, পদার্থ বিজ্ঞানী, কবি, ঐতিহাসিক, সংকলক, ভেষজবিদ। দেড়শতাধিক গ্রন্থের তিনি রচয়িতা। সতেরো বছর বয়সে তিনি গ্রহনক্ষেত্রের দূরত্ব মাপবার যন্ত্র তৈরী করেছিলেন। প্রায় নির্ভুলভাবে পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধ মেপে ছিলেন তিনি। তাঁর আশীটি অধ্যায় সমন্বিত "কিতাব-আল্-হিন্দ্" বা 'ভারতীয় ইতিহাস' এক অমূল্য সম্পদ। ভারত পরিভ্রমণ করে তিনি ঐ গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে ভারতীয় ধর্ম, দর্শন, সমাজ, জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের তিনি উল্লেখ করেছেন।

আলবিরুণী

ইবন খালদুন ছিলেন একজন বিখাত আরব ঐতিহাসিক। তাঁর রচিত ইতিহাস 'কিতাব-আল্-ইবার' তিন খণ্ডে সমাপ্ত। এই গ্রন্থে তিনি ইতিহাসের বিকাশ সম্বন্ধে সর্বপ্রথম একটি মতবাদ উপস্থাপিত করেন। তিনিই প্রথম সমাজ বিদ্যার ভিত্তি স্থাপন করেন। তাঁর পূর্বে ইতিহাস বিষয়ে একই সঙ্গে সামগ্রিক ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে, তাঁর মতো আর কোনো লেখকই পারেন নি। তিনি ছিলেন ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ ইতিহাস-দার্শনিক।

আল হাইথাম ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ দৃষ্টি বিজ্ঞানী। জুবের

ছিলেন শ্রেষ্ঠ রসায়নবিদ। এরা ছাড়া আল তবারি, ইবন বতুতা,

আলবিরুণীর পুঁথির একটি পৃষ্ঠা

ইবন-রুশদ্ প্রভৃতি প্রতিভাবান ব্যক্তি আরবীয় জ্ঞান বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছিলেন।

অনুশীলনী

১। আরবদেশ কোথায় অবস্থিত? এই দেশের ভৌগোলিক বিবরণী দাও।

২। ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বে আরবদের কাহিনী লিপিবদ্ধ কর।

৩। মহম্মদের জীবনী ও ইসলামের আবির্ভাবের ইতিহাস লিখ।

৪। ইসলামের পাঁচটি প্রাথমিক কর্তব্য কি কি ?

৫। ইসলাম ধর্ম প্রসারের বিভিন্ন কারণগুলো কি কি ?

৬। সভ্যতার ইতিহাসে আরব পণ্ডিতদের অবদান কিরূপ ছিল ?

৭। কম কথায় উত্তর দাও ঃ

(ক) আরব শব্দের অর্থ কি ?

(খ) আরব উপজাতির প্রধানদের কি বলা হত ?

(গ) কাবা কাকে বলে ?

(ঘ) মহম্মদের পরবর্তী খলিফা কে কে ?

(ঙ) মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও দার্শনিক কে ?

৮। টীকা লেখ ঃ

কর্ডোভা, আলবিরুণী, ইবন, খালদুন, হারুন-অল-রসিদ, হিজরা ।

৯। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(ক) মহম্মদের জন্ম হয় — শহরে, — খ্রীস্টাব্দে ।

(খ) ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী — হচ্ছেন একমাত্র ঈশ্বর এবং—তাঁর পুত্র ।

(গ) — পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ ।

(ঘ) আব্বাসীয় বংশের শ্রেষ্ঠ খলিফা ছিলেন — ।

(ঙ) কর্ডোভার শিল্পীদের একটি উল্লেখযোগ্য অবদান — ললিত কলা ।

(চ) — খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্স আক্রমণ করতে গিয়ে আরবরা পরাজিত হয় ।

(ছ) আধুনিক বীজগণিত — দের সৃষ্টি ।

১০। বন্ধনীস্থিত তিনটি উত্তরের মধ্যে সঠিক উত্তরটির নীচে দাগ দাও ঃ

(ক) হজরত মহম্মদের জন্ম হয় কত খ্রীস্টাব্দে (৬৩০ / ৫৭০ / ৫৫০)

(খ) খলিফা কে ছিলেন ? (ধর্মনেতা / সম্রাট / শিষ্য)

(গ) আব্বাসীয় বংশের পঞ্চম খলিফা কে ছিলেন ?
(আবুবকর / আলি / হারুণ-অল-রসিদ)

(ঘ) কিতাব-আল-হিন্দ্ কার লেখা ? (ইসাক / আলবিরুণী / ইবন্ সিন্না)

(ঙ) ইবন খালদুন কে ছিলেন ? (ঐতিহাসিক / কবি / পণ্ডিত)

ষষ্ঠ অধ্যায়

॥ মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপ ॥

Western Europe in medieval Period (800-1200 A.D Approx.)

[ক] শার্লেমান—পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের পুনরভ্যুদয় (Charlemagne—Revival of the Holy Roman Empire 800 A. D.)

৪৭৬ খ্রীস্টাব্দে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল। সমগ্র পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য বিভিন্ন জার্মান শক্তির মধ্যে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। পূর্ব রোম সাম্রাজ্য বা বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যের সম্রাট জাস্টিনিয়ান রোমের প্রাচীন গৌরব ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সফল হন নি। পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জার্মান জাতিগুলোর মধ্যে ফ্রাঙ্করা ছিল অন্যতম। ফ্রান্স ও জার্মানীর কতকাংশ জুড়ে ছিল তাদের রাজত্ব। এই ফ্রাঙ্কদের মধ্যে এমন একজন সম্রাটের আবির্ভাব হয়েছিল, যিনি শুধু জার্মানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন না, পৃথিবীর ইতিহাসেও ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট। তাঁর নাম শার্লেমান; অর্থাৎ চার্লস দি গ্রেট বা মহান চার্লস।

শার্লেমান

৭৬৮ খ্রীস্টাব্দে পঁচিশ বছর বয়সে তিনি ফ্রাঙ্কদের রাজা হন। মুঘল

সম্রাট আকবরের মত শার্লেমানও পুঁথিগত শিক্ষা লাভ করেন নি। কিন্তু তিনি আকবরের মতই ছিলেন বিচক্ষণ, সুশাসক, বিদ্যানুরাগী এবং দিগ্বিজয়ী। সমসাময়িক লেখক আইন হার্ড শার্লেমানের জীবনী রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থ থেকে আমরা শার্লেমানের চেহারা ও চরিত্রের পরিচয় পাই। তিনি ছিলেন লম্বা ও বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী এবং অসাধারণ শারীরিক শক্তিসম্পন্ন; এক ঘুষিতে তিনি সওয়ারশুদ্ধ একটা ঘোড়াকে ধরাশায়ী করে দিতে পারতেন। কোমরে তাঁর সব সময়ে ঝোলানো থাকত একটা তলোয়ার। তিনি খুব মিশুক ও কৌতুকপ্রিয় ছিলেন। অনুসন্ধিৎসা ছিল তাঁর চরিত্রের মহৎ গুণ।

শার্লেমানের রাজনৈতিক আদর্শ ছিল একটি ঐক্যবদ্ধ খ্রীস্টান সাম্রাজ্য গঠন করা। তাঁর যুদ্ধ জয়ের উদ্দেশ্য ছিল দুটি—প্রথমতঃ
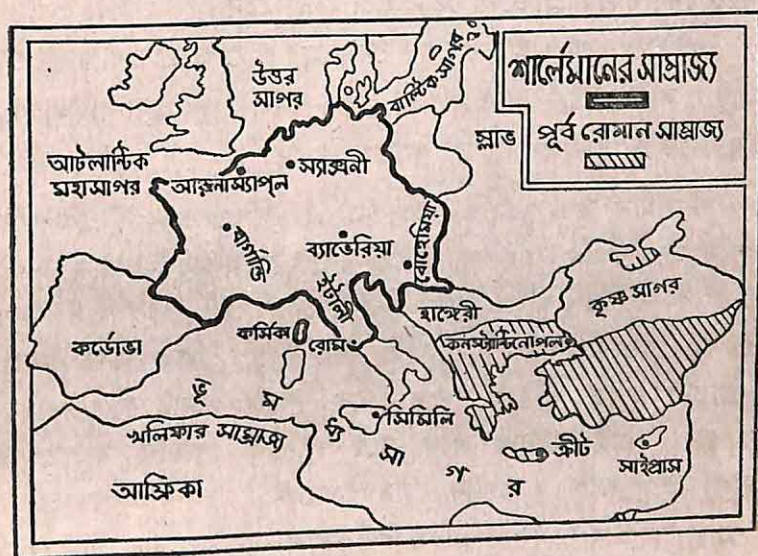
বহিঃশত্রুদের বশীভূত করা যাতে তারা সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে না পারে এবং দ্বিতীয়তঃ খ্রীস্টধর্মের প্রসার সাধন করা। সারা জীবনে তিনি মোট ৫০টি সামরিক অভিযান করেছিলেন। তার মধ্যে লোম্বার্ডদের বিরুদ্ধে পাঁচবার, স্যাক্সনদের বিরুদ্ধে আঠারো বার, ফ্রিজিয়ান ও ডেনদের বিরুদ্ধে তিনবার, স্লাভদের বিরুদ্ধে চারবার

স্যাক্সনদের বিরুদ্ধে দুবার, ইতালির মুসলমানদের বিরুদ্ধে পাঁচবার, বাইজান্টাইনদের বিরুদ্ধে দুবার এবং ব্রিটনদের বিরুদ্ধে দুবার। এই-ভাবে অনবরত যুদ্ধ করে তিনি একটি বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন।

লোম্বার্ডদের পরাজিত করে শার্লেমান ইতালির অধিকাংশ স্থান দখল করেছিলেন। অ্যাভর জাতিকে পরাজিত করে তিনি ব্যাভেরিয়া ও সন্নিহিত অঞ্চল দখল করেন। আরব মুসলমানদের পরাজিত করে তিনি কর্সিকা, সার্ডিনিয়া প্রভৃতি অঞ্চল দখল করেন। স্পেনে আরব মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রাথমিক ব্যর্থতার পর পীরেনিজ পর্বতের দক্ষিণে বার্সিলোনা পর্যন্ত জয় করেছিলেন। দীর্ঘ, রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর তিনি উত্তর জার্মানীর মূর্তিপূজক স্যাক্সনদের পরাজিত করেন এবং কঠোর অত্যাচারে তাদের খ্রীস্টধর্ম গ্রহণে বাধ্য করেন। স্যাক্সনীর উত্তর পুর্ব দিকে বসবাসকারী স্লাভদের তিনি পরাজিত করেন।

এইভাবে সমগ্র ইওরোপে শার্লেমানের শক্তি ও প্রতিপত্তি ছড়িয়ে পড়ে। বাগদাদের বিখ্যাত খলিফা হারুন-আলি-রশিদ এবং বাইজান্টা-ইন সম্রাট তাঁর রাজসভায় দূত পাঠিয়েছিলেন।

শার্লেমান যখন খ্যাতি ও প্রতিপত্তির শিখরে তখন তাঁর জীবনে আসে চূড়ান্ত সম্মান। এই সময় রোমের পোপ ছিলেন তৃতীয় লিও। ৮০০ খ্রীস্টাব্দে খ্রীস্টের জন্মদিন উপলক্ষে শার্লেমান রোমের সেণ্ট পিটার্স গীর্জায় প্রার্থনা করতে যান। প্রার্থনার পর পোপ লিও তাঁর মাথায় সম্রাটের মুকুট পরিয়ে দিয়ে তাঁকে রোমের সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পুনরভ্যুদয় ঘটে। প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট ওডোয়েসার এর মৃত্যুর প্রায় তিন শতাব্দীরও অধিককাল পরে, আবার সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটল। যে জার্মান বর্বরদের আক্রমণে রোম সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়েছিল সেই জার্মানদেরই এক রাজা শার্লেমান আবার রোমের সম্রাট হলেন। পুরোনো পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের উপর গড়ে উঠেছিল এই সাম্রাজ্য। খ্রীস্টধর্মের পৃষ্ঠপোষক শার্লেমান ধর্মকে ভিত্তি করে এই সাম্রাজ্য গঠন করেছিলেন। সমগ্র সাম্রাজ্যে তিনি খ্রীস্টধর্ম প্রচার

করেছিলেন। ধর্মাশ্রয়ী সাম্রাজ্য বলে এই সাম্রাজ্যকে বলা হত পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য।

শার্লেমানের অভিষেকের গুরুত্ব—রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মাধিষ্ঠানের সম্পর্ক (Importance of Coronation-relation between State and Church) ঃ শার্লেমানের সম্রাট পদে অভিষিক্ত হওয়া মধ্যযুগের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। **প্রথমতঃ**—পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতনের পরেও ঐক্যবদ্ধ রোম সাম্রাজ্য. সম্পর্কে রাজ নৈতিক ধারণার অবসান কখনোই ঘটেনি। শার্লেমানের সম্রাটপদ গ্রহণ ছিল জনপ্রিয় ধারণারই একটি বাস্তব রূপ। **দ্বিতীয়তঃ**—পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর যে অনিশ্চয়তা ও রাজনৈতিক অরাজকতার যুগ শুরু হয়েছিল, শার্লেমান কর্তৃক সম্রাট পদ গ্রহণের পর সেই অনিশ্চয়তার অবসান ঘটে। সুশাসন ও শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। **তৃতীয়তঃ**—শার্লেমান রোম সাম্রাজ্যের পুরোনো গৌরব ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর বিদ্যানুরাগের ফলে সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবন ঘটে। **চতুর্থতঃ**—এই ঘটনার ফলে পূর্ব বা বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত বিচ্ছেদ ঘটে। রোমের পতনের (৪৭৬খ্রীঃ) পর থেকে সাম্রাজ্যের পশ্চিমাংশ বাইজাণ্টাইন সম্রাটের অধীন ছিল। কিন্তু বাইজাণ্টাইন সম্রাটদের অক্ষমতায় তিক্ত বিরক্ত হয়ে পোপ ফ্রাঙ্ক রাজা শার্লেমানকেই রোমের সম্রাট পদে অভিষিক্ত করেন।

খ্রীস্টান জগতের ধর্মীয় প্রধান পোপ কর্তৃক শার্লেমানকে খ্রীস্টান সাম্রাজ্যের প্রধানরূপে অভিষিক্ত করা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এই ঘটনা থেকেই ভবিষ্যতে সম্রাট ও পোপদের অনিশ্চিত সম্পর্ক ও পারস্পরিক প্রাধান্য নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী দ্বন্দ্বের সূচনা হয়। পরবর্তীকালে পোপগণ এই ঘটনা থেকে সম্রাটদের ওপর নিজেদের প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চান। অপরদিকে পরবর্তী সম্রাটগণ ধর্মাধিষ্ঠানের ওপরও সার্বভৌমত্ব দাবী করেন।

শার্লেমান ছিলেন খুবই বুদ্ধিমান সম্রাট। শাসনকার্যে পোপকে তিনি হস্তক্ষেপ করতে দেননি। বরং পোপকে তিনি তাঁর সর্বসময় তাঁর

ওপর নির্ভরশীল করে রেখেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, তিনি পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং পবিত্র রোমান সম্রাটরূপে রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক জগতের সর্বময় প্রভু। চার্চকে তিনি সাম্রাজ্যের অন্যতম বিভাগে পরিণত করেন। ধর্মীয় বিষয়ে পোপ ছিলেন সম্রাটের অধীন। শার্লেমান সম্রাটরূপে বিভিন্ন ধর্মযাজকদের মনোনীত করতেন, চার্চের সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণ করতেন, যাজক সভা আহ্বান করতেন। ধর্মাধিষ্ঠানের সর্ব বিষয়ে তিনি তাঁর নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

শার্লেমানের রাজসভা এবং শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা (Court and patronage of art and literature) :

শার্লেমান রোমের সম্রাট হবার পর রোম সাম্রাজ্যের লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট ছিলেন। জার্মানীর আকেন শহরে তিনি নতুন রাজধানী স্থাপন করেন, জমকালো রাজপ্রসাদ ও গীর্জা তৈরী করেন। স্বয়ং নিরক্ষর হলেও, বিদ্যাচর্চায় তাঁর অনুরাগ ছিল অসীম। লিখতে তিনি কোনদিনই শেখেন নি, তবে ক্রমে ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায় কিছু কিছু পড়তে শিখেছিলেন। খেতে খেতে তিনি ইতিহাস শুনতেন। দেশ বিদেশ থেকে তিনি বিখ্যাত পণ্ডিতদের এনেছিলেন, তাঁর সাম্রাজ্যে বিদ্যাচর্চা প্রসারের জন্য। তখনকার দিনে ইওরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত এ্যালকুইনকে তিনি নিজের পরামর্শদাতা ও সভাপণ্ডিতের পদে অধিষ্ঠিত করেন। এ্যালকুইন ছিলেন ইংলণ্ডের অধিবাসী। লোম্বার্ডির ধর্মযাজক পলকেও শার্লেমান তাঁর রাজসভায় নিয়ে এসেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক। পিসার অধিবাসী বৈয়াকরণ পিটার শার্লেমানকে ব্যাকরণ শিক্ষা দিতেন। এছাড়া জীবনীকার আইন হার্ড, কবি থিওডলফ, এঙ্গিলবার্ট প্রভৃতি মনীষী তাঁর রাজসভাকে সমৃদ্ধ করেছিলেন।

বিভিন্ন পণ্ডিতদের অধীনে শার্লেমান বহু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রাজপ্রাসাদের মধ্যেও একটি বিদ্যালয় ছিল। রাজ পরিবারের ছেলেমেয়েরা সেখানে বিদ্যাভ্যাস করত। সাম্রাজ্যের কোথাও কোন

প্রতিভাবান ছেলের সন্ধান পেলে শার্লেমান তাকে রাজপ্রাসাদের বিদ্যালয়ে পড়বার সুযোগ দিতেন। গীর্জা ও মঠগুলোতেও বিদ্যালয় খোলা হয়েছিল। তাঁর নির্দেশে প্রাচীন জ্ঞান বিজ্ঞানের পুঁথিগুলো সংরক্ষণের জন্য নকল করে রাখা হত। নির্মাতারূপেও তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। বিরাট বিরাট প্রাসাদ ও গীর্জা তিনি নির্মাণ করিয়েছিলেন। মিনজ-এ তিনি একটি বিরাট সেতু নির্মাণ করেন। তিনি রোমানেস্ক স্থাপত্যরীতির প্রচলন করেছিলেন। রাইন ও ডানিয়ুব নদীর সংযোগ সাধনকারী একটি খাল তিনি কাটিয়েছিলেন।

এক অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে সম্রাট হয়ে শার্লেলান সভ্যতা ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছিলেন। তাই ইতিহাসে তিনি শুধুমাত্র সমর বিজয়ী বা সাম্রাজ্যের অধীশ্বররূপেই পরিগণিত হননি, তিনি পরিচিত হয়েছিলেন মহান রূপে।

[খ] খ্রীস্টান মঠ—সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীগণ—মঠবাসীদের জীবনষাত্রা (বেনিডিক্টিন ব্রত) [Monasteries—Monks and Nuns—life centring round monasteries (Benedictine vows)] :

মধ্যযুগে খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের একটি বিরাট অংশ মঠ থেকে সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করতেন। মঠে এঁরা সাধারণতঃ বিদ্যাচর্চা ও ধর্মসাধনায় ব্যাপৃত থাকতেন। প্রথমে কিন্তু খ্রীষ্টধর্মে মঠ বা সন্ন্যাসজীবনের কোন উল্লেখ ছিল না। সম্ভবতঃ খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতাব্দী থেকে মিশর ও পূর্ব ইওরোপে মঠবাসী সন্ন্যাস জীবনের সূচনা হয়। প্রথমে সন্ন্যাসীরা আত্মীয়স্বজন, ধনসম্পত্তি পরিত্যাগ করে, নির্জনে দারিদ্র ও কঠোর আত্মসংযমের মধ্যে আধ্যাত্মিক জীবনযাপন করতেন। ধীরে ধীরে প্রয়োজনের তাগিদে তাঁরা একসঙ্গে কুটির নির্মাণ করে বাস করতে থাকেন। খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যে মঠবাসী সন্ন্যাস জীবনের সূচনা হয়। ধীরে ধীরে সুনিয়ন্ত্রিত সংঘবদ্ধ মঠগুলো বেড়ে চলে। বর্বর জাতিদের মধ্যে খ্রীস্টধর্ম প্রচারের কাজে পোপগণ সন্ন্যাসীদের সাহায্য গ্রহণ করতেন।

সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ দুইই ছিলেন। পুরুষদের বলা হত 'মঙ্ক' এবং মহিলাদের বলা হত 'নান'। পুরুষদের মঠকে

স্যানগিয়োভানি মনাস্টারি

বলা হত 'মনাস্টারি' এবং মেয়েদের মঠকে বলা হত 'নানারি'। সন্ন্যাসীদের মঠের অধ্যক্ষকে বলা হত এ্যাবট বা প্রায়র ; এবং সন্ন্যাসিনীদের মঠের অধ্যক্ষার নাম ছিল এ্যাবেস বা প্রায়রেন্‌। সন্ন্যাসী এবং সন্ন্যাসিনীরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন। ষষ্ঠ শতাব্দীতে মঠ ও সন্ন্যাসীদের সংখ্যা প্রচুর বৃদ্ধি পায়। এই সন্ন্যাসীদের জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করবার জন্য এবং খ্রীষ্টধর্মের মূলনীতিগুলো যাতে এইসব মঠে অব্যাহত থাকে সেজন্য তখন সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলী প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। এই সময় মণ্টি ক্যাসিনো মঠের প্রধান সন্ত বেনিডিক্ট তাঁর মঠের জন্য যে নিয়মবিধি প্রণয়ন করেন, তা যেমন নীতিনিষ্ঠ তেমনি যুগোপযোগী। তাঁর নিয়মবিধি ধীরে ধীরে অন্যান্য সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের আদর্শ হয়ে ওঠে। তাঁর মতাবলম্বীদের বেনিডিক্‌টিন সম্প্রদায় বলা হত। সন্ত বেনিডিক্ট ছিলেন মধ্যযুগের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের ইতিহাসে একজন উল্লেখযোগ্য পুরুষ। তাঁর প্রচলিত নিয়মবিধি মঠ ও মঠবাসী সন্ন্যাসীদের দৈনন্দিন জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করত। তাঁর নিয়মানুযায়ী, প্রত্যেক মঠে মঠবাসী সন্ন্যাসীদের দ্বারা নির্বাচিত

একজন মঠাধ্যক্ষ বা এ্যাবট থাকবেন। সন্ন্যাসীরা তার নির্দেশ পালন করতে বাধ্য থাকবে। সন্ন্যাসী হবার পূর্বে, যোগ্যতা প্রমাণের জন্য প্রত্যেককে কিছুকালের জন্য শিক্ষা–নবীশ থাকতে হবে। সন্ন্যাসীদের পক্ষে দারিদ্র্য, সংযম ও আনুগত্য পালন ছিল অপরিহার্য। বিবাহিত জীবন ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা তাঁদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। বেনিডিক্ট ছিলেন কঠোর পরিশ্রমে বিশ্বাসী। দৈনন্দিন প্রার্থনা করা ছাড়াও সন্ন্যাসীদের মঠের সমস্ত কাজ স্বহস্তে করতে হত। মঠের প্রয়োজনের জন্য সংলগ্ন জমিতে সন্ন্যাসীদের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য ইত্যাদি চাষ করতে হত।

সন্ত বেনিডিক্ট

মাংসভক্ষণ ছিল নিষিদ্ধ। দিনে তাঁদের সাতবার প্রার্থনা করতে হত। এছাড়া প্রতিদিন পঠন পাঠন ও প্রাচীন পুঁথি নকল করা ছিল অবশ্য কর্ত্তব্য। বেনিডিক্টিন সম্প্রদায়ের মঠগুলো ছিল যতদূর সম্ভব স্বয়ং-সম্পূর্ণ। প্রত্যেক মঠে গীর্জা, সন্ন্যাসীদের থাকবার স্থান, গ্রন্থাগার, বাগান, শস্যক্ষেত্র, পুকুর ও পেঁষাই-কল থাকত। এছাড়া থাকত আর্ত ও অসুস্থদের জন্য হাসপাতাল এবং দরিদ্র ও তীর্থযাত্রীদের জন্য অতিথিশালা। মধ্যযুগের ইতিহাসে বেনিডিক্টিন সম্প্রদায়ের প্রভাব ছিল অপরিসীম। বিদ্যাচর্চায় ও খ্রীস্টধর্ম প্রচারে এই সম্প্রদায় ছিল অগ্রগণ্য। এছাড়া, এই সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে ২৪ জন পোপ পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

জ্ঞানের সংরক্ষণ ও বিতরণে খ্রীস্টান মঠগুলোর ভূমিকা (The role of monasteries in the preservation and dissemination of learning) ঃ

মধ্যযুগ ছিল অনিশ্চিয়তা, অরাজকতা, অশান্তি ও হানাহানির যুগ।

সাধারণ মানুষের মধ্যে বিদ্যাচর্চার কোন প্রচলন ছিল না। এই যুগে জ্ঞান ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল ছিল খ্রীস্টান মঠগুলো। প্রত্যেক মঠে ছিল বড় বড় পাঠাগার ও বিদ্যালয়। বিদ্যালয় স্থাপন ও শিক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল মঠগুলো। নিয়মিত বিদ্যাচর্চা করে, পাণ্ডুলিপি লিখে ও নকল করে সন্ন্যাসীরা মধ্যযুগে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ই ছিলেন শিক্ষিত শ্রেণী। ল্যাটিন ভাষা ছিল শিক্ষার বাহন। সাধারণ লোক যখন প্রাচীন গ্রীক-রোমানদের বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদির কথা ভুলে গিয়েছিল, তখন একমাত্র মঠগুলো ছিল, এইসব প্রাচীন পুঁথি সংরক্ষণের ও চর্চার কেন্দ্র। সন্ন্যাসীদের রচিত পুঁথিপত্রর থেকে আমরা মধ্যযুগের সমাজ জীবন ও ইতিহাস সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করতে পারি। প্রতি বছরের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সমূহ ধারাবাহিকভাবে মঠগুলোতে লিপিবদ্ধ করা হত।

ক্লুনির সংস্কার আন্দোলন [Cluny (Freeing the church from corruption, secularisation and feudalisation)] :

দশম শতাব্দীতে ইওরোপের সমাজ জীবনে ধর্মাধিষ্ঠানের প্রভাব ছিল সর্বব্যাপ্ত। কিন্তু বহু স্থানে ধর্মযাজকদের শৃঙ্খলা, নীতিনিষ্ঠা ও ধর্মভাবের অভাবে ধর্মাধিষ্ঠান দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল।

মধ্যযুগের ধর্মাধিষ্ঠান বা চার্চ ছিল জমির সবচেয়ে বড় মালিক। এই জমি চার্চ লাভ করত নানা উপায়ে। ঈশ্বরকে তুষ্ট করার জন্য কেউ চার্চকে জমিদান করত, কেউ চার্চের জনহিতকর কাজের সাহায্যের জন্য জমি দান করত, আবার অনেকসময় বিভিন্ন রাজারা বা সামন্ত প্রভুরা কোন রাজ্য জয় করার পর বিজিত রাজ্যের কিছু অংশ চার্চকে দান করত। এইভাবে চার্চ বিশাল ভূসম্পত্তির মালিক হয়ে উঠেছিল। মধ্যযুগে যার জমি যত বেশী ছিল, সেই ছিল তত বেশী ধনী। তাই পোপ ছিল ধনীশ্রেষ্ঠ। ইওরোপের নানাস্থানে চার্চের জমিদারির তত্ত্বাবধান করত উচ্চশ্রেণীর যাজকরা। সামন্ত-প্রভুদের মত চার্চও ভূমিদাসদের মধ্যে জমি বিলি করত। ক্রমে উচ্চ পদস্থ

ধর্মযাজক ও মঠাধ্যক্ষরা ধনসম্পদের প্রাচুর্যের ফলে জমিদারদের মতই বিলাসী, অকর্মণ্য, দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে ওঠেন। পোপ ও উচ্চ শ্রেণীর যাজকরা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কর্তব্য সম্পাদনের চেয়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তারে মনোযোগী হন। অর্থের পরিবর্তে উচ্চ শ্রেণীর যাজক পদ ক্রয় করা যেত। ধর্মচ্যুত করার ভীতি প্রদর্শন করে, এমন কি সময়ে সময়ে দলিল জাল করেও পোপরা পার্থিব বিষয়ে প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করতেন। **চার্চের এই নীতিজ্ঞানহীনতা ও পার্থিব ভোগ বিলাসের বিরুদ্ধে দশম শতাব্দীতে এক মুক্তি আন্দোলন দেখা দিয়েছিল। এই আন্দোলনের সূচনা হয়, ৯১০ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ক্লুনির মঠকে কেন্দ্র করে।** ক্লুনি সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা বিভিন্ন অঞ্চলে মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। নিবেদিত প্রাণ মঠাধ্যক্ষদের অধীনে এই সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা কঠোভাবে বেনিডিক্টিন নিয়মাবলী মেনে চলতেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল ধর্মযাজকদের নৈতিক উন্নতি সাধন করা ও ধর্মপথে ফিরিয়ে আনা। এই কাজে তাঁদের প্রধান সহায় ছিলেন পবিত্র রোমান সম্রাট তৃতীয় অটো। তিনি খ্রীস্টধর্মকে দুর্নীতি মুক্ত করবার জন্য বিখ্যাত জ্ঞানী গেরবার্টকে পোপ পদে মনোনীত করেন। গেরবার্ট পরিচিত হয় পোপ দ্বিতীয় সিলভেস্টার নামে। এইভাবে ক্লুনির সংস্কার আন্দোলনের ফলে আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণ ঘটে এবং পরবর্তীকালের ইতিহাসে চার্চ হয়ে ওঠে সর্বশক্তিমান। ক্লুনির সংস্কার আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল পোপ ও যাজকদের সম্রাট ও সামন্ত প্রভুদের প্রভাব মুক্ত করা, পোপের সার্বিক কর্তৃত্বাধীনে চার্চকে স্বাধীন সংগঠনে পরিণত করা এবং খ্রীস্টান জগতে রাজশক্তির ওপরে ধর্মীয় প্রধানরূপে পোপের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা! ফলে, খ্রীস্টান জগতের ধর্মীয় প্রধান পোপের সঙ্গে রাজনৈতিক প্রধান পবিত্র রোমান সম্রাটদের মধ্যে কতৃত্বের দ্বন্দ্ব সুরু হয়।

[গ] সম্রাট ও পোপদের মধ্যে কর্তৃত্বের দ্বন্দ্ব [Investiture issue (Reference only)]:

মধ্যযুগের ইওরোপের ইতিহাসে পোপ ও সম্রাটদের মধ্যে ক্ষমতা

নিয়ে এক দীর্ঘস্থায়ী দ্বন্দ্ব চলেছিল। এই দ্বন্দ্ব প্রায় দুশো বছর ধরে চলেছিল। এই দ্বন্দ্বের সূচনা হয় সম্রাট চতুর্থ হেনরীর (১০৫৬—১১০৬ খ্রীঃ রাজত্বকালে। তাঁর রাজত্বকালের সূচনায় পোপের নির্বাচনে ভার সর্বোচ্চ শ্রেণীর যাজকদের ওপর ন্যাস্ত হয়। সম্রাটগণ এই নির্বাচনকে স্বীকৃতি জানাতে বাধ্য থাকতেন। এইভাবে চার্চের স্বাধীন সংগঠনের সূচনা হয়। ১০৭৩ খ্রীস্টাব্দে সপ্তম গ্রেগরী পোপ পদে নির্বাচিত হন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল চার্চের সকল বিষয়ে পোপের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। তিনি ভূস্বামী ও সামন্ত প্রভুদের নিজ এলাকার যাজকদের নির্বাচনের অধিকার বিলুপ্ত করেন। তিনি ঘোষণা করেন, পোপ পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে সম্রাটদেরও প্রভু এবং সম্রাটদের ক্ষমতাচ্যুত করবার অধিকার পোপের আছে। অপরদিকে রোমান সম্রাজ্যের প্রধানরূপে সম্রাট চতুর্থ হেনরী কোন বিষয়ে অধিকার হারাতে রাজী ছিলেন না। ফলে উভয়পক্ষে দ্বন্দ্ব সুরু হয়।

চতুর্থ হেনরী পোপের পদচ্যুতির আদেশ দেন। প্রত্যুত্তরে পোপ সপ্তম গ্রেগরী সম্রাটকে ধর্মচ্যুত বলে ঘোষণা করেন। অধীনস্ত সামন্ত প্রভুরা ধর্মচ্যুত সম্রাটকে মানতে অস্বীকার করল; ফলে সিংহাসন বজায় রাখবার জন্য সম্রাট চতুর্থ হেনরী ইটালীর ক্যানোসা নামক স্থানে গিয়ে পোপের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে ক্ষমা ভিক্ষা করতে বাধ্য হলেন। এইভাবে পোপের প্রাথমিক জয় সূচিত হল।

কিন্তু পোপের ক্ষমালাভ করবার পর চতুর্থ হেনরী দ্রুত শক্তি সঞ্চয় করেন। রাজকীয় কর্তৃত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করে তিনি রোম আক্রমণ করেন এবং পোপকে আবার পদচ্যুত বলে ঘোষণা করেন। পোপ নিরুপায় হয়ে সালারনো নামক স্থানে পালিয়ে যান এবং সেখানে ১০৮৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু চতুর্থ হেনরী পোপদের ক্ষমতা খর্ব করতে পারেননি। পরবর্তী পোপ আবার তাঁকে ধর্মচ্যুত করেন এবং ১১০৬ খ্রীষ্টাব্দে ঐ অবস্থায় তিনি মারা যান।

এইভাবে দীর্ঘদিন ধরে সম্রাট ও পোপদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলে।

প্রাথমিক পর্যায়ে পোপেরা জয়যুক্ত হলেও, শেষ পর্যন্ত সম্রাট ও পোপের মধ্যে একটা আপোষ হলো।

একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে শিক্ষাব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয় (11 th and 12 th centuries : from monastic and cathedral schools to University etc.) :

মধ্যযুগে শিক্ষাদানের প্রাথমিক দায়িত্ব ছিল গীর্জা সংলগ্ন বিদ্যালয় ও খ্রীস্টান মঠপরিচালিত বিদ্যালয়গুলোর। ধর্মযাজকরাই ছিলেন মধ্যযুগের শিক্ষিত শ্রেণী। দেশে বিদ্যালয় স্থাপন করা, শিক্ষা পরিচালনা করা ইত্যাদি ছিল তাঁদের দায়িত্ব। ল্যাটিন ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হত। এই সব বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষা ছিল প্রধান। একাদশ শতাব্দী থেকে ইওরোপে দ্রুত শিক্ষার প্রসার ঘটে। এর কয়েকটি বিশেষ কারণ ছিল। ক্লুনির সংস্কার আন্দোলনের পর ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ে ধর্মীয় আইনে জ্ঞান সম্পন্ন পণ্ডিতদের চাহিদা বেড়ে যায়। অপরদিকে সামন্ত প্রভুদের দরবারে রাজকার্যে সহায়তা করবার জন্য এবং নব প্রতিষ্ঠিত শহরগুলোর শাসন পরিচালনার জন্য সাধারণ আইন ও ল্যাটিন ভাষায় পরিদর্শী ব্যক্তিদের চাহিদাও বেড়ে যায়। গীর্জার অধীনে ধর্মীয় শিক্ষাব্যবস্থা এই নতুন প্রয়োজন মেটাতে অপারগ ছিল। এই পরিস্থিতি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠার পথ সুগম করে।

ল্যাটিন শব্দ 'ইউনিভারসিটাস' থেকে ইউনিভারসিটি বা বিশ্ববিদ্যালয় কথাটির উৎপত্তি। এর অর্থ ছাত্র বা পণ্ডিতদের সংঘ। এই বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল দুভাবে। কখনো কখনো বিখ্যাত পণ্ডিতদের ঘিরে ছাত্র সম্প্রদায় জুটত। তারা আসত ইওরোপের নানা দেশ থেকে। পণ্ডিতদের কাছে তারা বিদ্যাশিক্ষা করত এবং তাঁদের সঙ্গেই বাস করত। এমনি করেই গড়ে উঠত বিশ্ববিদ্যালয়। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় এভাবে গড়ে ওঠে। আবার কখনো কখনো বিভিন্ন দেশের জ্ঞানলাভেচ্ছু ছাত্রেরা কোন এক স্থানে মিলিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করত। পণ্ডিতরা সেখানে শিক্ষাদান করতেন। বোলনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে এভাবে।

নতুন গড়ে ওঠা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল ফ্রান্সের প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়, ইটালির বোলনিয়া ও সালারনো বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইংলণ্ডের অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়। কতকগুলো বিশ্ববিদ্যালয় আবার বিশেষ বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য বিখ্যাত ছিল। যেমন—ধর্মতত্ব শিক্ষার জন্য প্যারিস, চিকিৎসাবিদ্যার জন্য সালারনো, আইনশিক্ষার জন্য বোলনিয়া প্রভৃতি।

শিক্ষা ছিল প্রধানতঃ বৃত্তিমূলক। ধনী দরিদ্র সকল শ্রেণীর ছাত্ররাই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত। পাঠক্রম শেষ করবার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করা যেত। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সাধারণতঃ ধর্মতত্ত্ব. দর্শন, আইন ও চিকিৎসাশাস্ত্র পড়ানো হত। সাধারণতঃ হাতে লেখা পুঁথি ব্যবহার করতে হত। পুঁথির স্বল্পতা থাকায় বহু ছাত্র মিলে একই পুঁথি ব্যবহার করত।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রভাব ছিল অপরিসীম। জ্ঞানার্জনের উৎসাহ বাড়িয়ে তোলে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। প্রচলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষাব্যবস্থায়ও উন্নতি ঘটে। ফ্রান্স, ইটালি, জার্মানীতে শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়।

বিদ্যাচর্চার এই নবযুগে ইওরোপে এমন কয়েকজন মনীষীর দেখা পাওয়া যায় যাঁদের বিদ্যাবুদ্ধি ও প্রতিভা মানব সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করেছে।

মহাকবি দান্তে

এ যুগের দার্শনিকদের মধ্যে **পিটার আবেলার্ড, বার্ণাড, টমাস আকুইনাস, রজার বেকন, এ্যালবার্টাস ম্যাগনাস, দান্তে** প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। বার্ণাড নৈতিকতা ও আধ্যাত্মবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ছিলেন ধর্মীয় আইনের ব্যাখ্যাতা। পিটার আবেলার্ড ছিলেন একজন যুক্তিবাদী চিন্তাবিদ। তিনি বলেছিলেন, 'সংশয় থেকেই আসে অনুসন্ধিৎসা, এবং অনুসন্ধিৎসা থেকে লাভ করা যায় সত্যজ্ঞান।' রজার বেকন

বৈজ্ঞানিক হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান ও গণিতের সাহায্যেই প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা যায়, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। তিনি আরবীয় দৃষ্টিবিজ্ঞান শিক্ষা করেছিলেন এবং স্বয়ং বহু লেনস্ তৈরী করেছিলেন। ইটালির দান্তে আলিখিয়েরি ১২৬৫ খ্রীস্টাব্দে ফ্লোরেন্সে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য **ডিভাইন কমেডি** কেবল মধ্যযুগে নয়, সমগ্র মানব সভ্যতার এক অপূর্ব সৃষ্টি।

মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সাধারণতঃ ছাত্ররা পণ্ডিতদের সঙ্গেই বাস করত। খড়ের আসনে বসে তারা পণ্ডিতদের বক্তৃতা শুনত। আত্মরক্ষা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা লাভের জন্য অধ্যাপক ও ছাত্ররা গোষ্ঠীবদ্ধ হত। ছাত্রদের সুশৃঙ্খল আচরণ করতে হত। অধ্যাপকদের প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রদর্শন করত তারা। কখনো কখনো সংঘবদ্ধ ছাত্ররা নিয়মভঙ্গকারী অধ্যাপকদের নিয়ম মানতে বাধ্য করত বা পরিত্যাগ করত।

অনুশীলনী

১। শার্লেমান কে ছিলেন? তিনি কিভাবে ঐক্যবদ্ধ খ্রীস্টান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন?

২। সম্রাট পদে শার্লেমানের অভিষেকের গুরুত্ব কি?

৩। শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকরূপে শার্লেমানের পরিচয় দাও।

৪। বেনিডিক্ট কে ছিলেন? তাঁর প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায় সম্বন্ধে কি জান?

৫। ক্লুনির সংস্কার আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখ।

৬। মধ্যযুগে সম্রাট ও পোপদের মধ্যে কর্তৃত্বের দ্বন্দ্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণী লেখ।

৭। মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কিভাবে গড়ে ওঠে? কি কি বিষয় সেখানে পড়ানো হত?

৮। শূন্যস্থান পূরণ কর:

(ক) সন্ন্যাসীদের মঠের অধ্যক্ষকে বলা হত — বা —।

(খ) সম্রাট ও পোপদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলেছিল — বছর ধরে।

(গ) সালারনো বিশ্ববিদ্যালয় বিখ্যাত ছিল — বিদ্যার জন্য।

৯। টীকা লেখ:

পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য, সন্ত বেনিডিক্ট, পিটার আবেলার্ড।

সপ্তম অধ্যায়

॥ মধ্যযুগের ইওরোপে সামন্ততন্ত্র ॥
(Feudalism in Medieval Europe)

সামন্ততন্ত্র (Feudalism) :

বর্বরদের আক্রমণের ফলে যখন রোম সাম্রাজ্যের পতন হয়, তখন সমস্ত ইওরোপের জীবনে নেমে এল এক প্রচণ্ড অরাজকতার অন্ধকার। রাস্তাঘাট সব গেল ধ্বংস হয়ে, ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেল, পথে ঘাটে চোর-ডাকাতের উপদ্রব দেখা দিল। ফলে, সামাজিক জীবনের নিরাপত্তা নষ্ট হল, এক জায়গার লোকের সঙ্গে আরেক জায়গার লোকের সম্বন্ধ গেল ছিন্ন হয়ে। মানুষ বাস করতে লাগল বিচ্ছিন্নভাবে। নির্ভরশীল হয়ে পড়ল স্থানীয় সম্পদের ওপর। শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব সাধারণ মানুষ অর্পণ করল স্থানীয় শক্তিশালী লোকদের হাতে। এই শক্তিশালী লোকদের শাসন তারা মেনে নিল, স্বীকার করে নিল প্রভু বলে। ব্যবসা-বাণিজ্যের অভাবে একমাত্র সম্পদ হয়ে দাঁড়াল জমি। আর প্রভুরাই হল জমির মালিক। ওই জমি আর প্রভুকে আঁকড়ে ধরেই মধ্যযুগের মানুষ গড়ে তুলল ছোট ছোট এবং পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন এক একটি কেন্দ্র। অপরদিকে, রোমান সাম্রাজ্যে দাস প্রথা চালু ছিল। বড় বড় জমিদাররা জমিতে দাস-পরিশ্রমে কৃষি উৎপাদন করতেন। রোম সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে দাসপ্রথাও প্রায় অচল হয়ে পড়ে। যে বর্বর জার্মান জাতিগুলো ইওরোপে আধিপত্য বিস্তার করেছিল, তারা দাসপ্রথায় বিশেষ অভ্যস্ত ছিল না। জার্মান জমিদাররাও তাই দাস শ্রমের নির্ভর না করে আশ্রিত ছোটো ছোটো চাষীর শ্রমে ভাগ বসানোই সুবিধাজনক মনে করল। এইভাবে জমিকে কেন্দ্র করে দুটি শ্রেণী গড়ে ওঠে। জমির মালিক বা জমিদার শ্রেণী এবং তাদের আশ্রিত ছোট চাষীরা। শক্তিশালী জমির মালিকরা

স্বাধীনভাবে নিজ নিজ এলাকায় ইচ্ছে মত রাজত্ব করতে লাগল। এরাই পরিচিত হল সামন্ত নামে। এই সামন্তরাই ছিল তৎকালীন সমাজের সবচেয়ে শক্তিশালী অংশ। তাই ঐ সময়ের সমাজকে অভিহিত করা হয় 'সামন্ত-সমাজ' নামে।

সামন্ত-সমাজ প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—যাজক শ্রেণী, শাসক শ্রেণী ও ভূমিদাস শ্রেণী। তবে সামাজিক মর্যাদা অনুসারে ভাগ করলে সমাজে দুটি শ্রেণী ছিল—হুজুর শ্রেণী আর মজুর শ্রেণী। হুজুর অর্থাৎ মালিক শ্রেণী গড়ে উঠেছিল যাজক ও সামন্তদের নিয়ে আর মজুর শ্রেণীতে ছিল ভূমিদাসরা। আশ্রিত ছোট চাষীরা ছিল ভূমিদাস। এরা দাস নয়। আইনতঃ এরা প্রভুর সম্পত্তি ছিল না। কিন্তু নির্দিষ্ট জমি ছেড়ে ইচ্ছানুসারে চলে যাওয়ার স্বাধীনতা তাদের ছিল না। তাই এদের বলা হত ভূমিদাস।

রাজা ছিলেন দেশের প্রথম ও প্রধান মালিক, রাষ্ট্রের কর্ণধার ও প্রজার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। রাজা দেশের ভূ-সম্পত্তি বিলি করে দিতেন কয়েকটি প্রধান সামন্তকে। প্রধান সামন্তরা আবার রাজার কাছ থেকে প্রাপ্ত জমি বিলি করে দিতেন অধস্তন কয়েকজন ছোট সামন্ত বা উপসামন্তকে। উপসামন্তরাও ঐভাবে তাঁদের জমি দিতেন অধস্তন কিছু জমিদারকে। এমনি করেই রাজা থেকে ক্ষুদ্রতম জমিদার পর্যন্ত বিভিন্নশ্রেণীর মালিকের মধ্যে জমি ভাগাভাগি হয়ে যেত। বিভিন্ন স্তরের জমির মালিকরা কিন্তু নিজেদের সব জমিই বিলি করে দিত না, কিছু জমি রেখে দিত সম্পূর্ণ নিজেদের দখলে। নিজেদের দখলে রাখা কতকাংশে মালিকরা বসাত ভূমিদাসদের, আর বাকীটা থাকত তাদের খাস জমি হিসেবে। **এইভাবে গড়ে উঠত সামন্ত সমাজের স্তরবিভাগ।**

তাহলে দেখা যাচ্ছে জমির বিলি ও মালিকানার ভিত্তিতে প্রত্যেক সামন্ত মালিক বা প্রভুর দুটি সম্পর্ক গড়ে উঠত—একটি হচ্ছে সামন্তদের সঙ্গে উচ্চতর সামন্তদের ও রাজার সম্পর্ক এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে তাদের অধীনস্থ ভূমিদাসদের সম্পর্ক। ভূমিদাসরা বা সামন্ত উভয়েরই আনুগত্য

ছিল আপন উর্ধ্বতন প্রভুর কাছে। রাজায়-প্রজায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ছিল খুবই কম। সামন্তরা নিজ নিজ এলাকায় ছোটো ছোটো রাজা হয়ে বসেছিল। রাজকার্য চলত সামন্তদের সাহায্যে। যুদ্ধের সময় তারাই রাজাকে সৈন্য যোগাত। রাজার প্রাপ্যও আদায় করে দিত সামন্তরা। এইভাবে রাজা ছিলেন নামে মাত্র দেশের অধীশ্বর।

অষ্টম শতাব্দী থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত সুদূর উত্তর থেকে আগত জলদস্যুদের বিভীষিকা ও সন্ত্রাসের জন্য, দক্ষিণ থেকে আরবদের আক্রমণের ভয়ে, পূর্ব ইওরোপ থেকে অসভ্য জাতিদের অভিযানের জন্য এবং আভ্যন্তরীণ বিকাশের পূর্ণ ফল হিসেবে পশ্চিম ইওরোপের রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থাকে সংহত ও সুদৃঢ় করবার প্রয়োজন ছিল। সামন্ত-তান্ত্রিক ব্যবস্থা এই যুগের প্রয়োজনেই গড়ে উঠেছিল। সামন্ততান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে গড়ে উঠেছিল সামরিক প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা। প্রত্যেক সামন্ত প্রভুর নিজস্ব প্রতিরক্ষার ব্যবস্থ্য ছিল এবং প্রত্যেক সামন্ত উর্ধ্বতন প্রভুর কাছে সামরিক দায়িত্ব পালনে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল। রাজার কাছ থেকে সরাসরি জমিদারী প্রাপ্ত অত্যন্ত ক্ষমতাশালী জমিদার প্রভুরা সাধারণতঃ ডিউক এবং আর্ল নামে পরিচিত ছিলেন। এঁরা নিজেদের অধীনে বিরাট সংখ্যক যোদ্ধাদল বা সশস্ত্র অনুচর রাখতেন। ডিউক এবং আর্লদের অধীনস্থ জমিদাররা ব্যারন নামে পরিচিত ছিলেন। এঁরাও নির্দিষ্ট সংখ্যক যোদ্ধার দল মজুত রাখতেন। ব্যারনদের অধীনস্থ ছিলেন নাইটরা। এঁরা ছিলেন ক্ষুদ্রতম ভূস্বামী এবং স্বতন্ত্র যোদ্ধা-শ্রেণী। এই সামরিক স্তরবিভাগের বাইরে ছিল কৃষকরা। তাদের দায়িত্ব ছিল কৃষি উৎপাদন।

বড় সামন্ত যখন ছোট সামন্তকে জমি দান করতেন, তখন পরিবর্তে পেতেন ছোট সামন্তের আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার অঙ্গীকার। দুজনেই পরস্পরের প্রতি কতকগুলো কর্তব্য পালন করবার দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। বড় সামন্ত ছোট সামন্তকে বাইরের শত্রু বা প্রজাদের বিদ্রোহের সময় রক্ষা করতেন। ছোট সামন্তের কর্তব্য ছিল প্রভুর আপদে বিপদে সাহায্য করা এবং প্রভুর ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক

সৈন্য মজুত রাখা। বড় সামন্ত যদি শত্রুর হাতে বন্দী হতেন, তাহলে, ছোট সামন্তের কর্তব্য ছিল অর্থ দিয়ে প্রভুকে উদ্ধার করা।

সামন্ত প্রভুরা নিজেদের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকত। জমির পরিমাণ এবং খাজনা প্রদানকারী অধীনস্থ কৃষকদের সংখ্যার ওপর সামন্ত প্রভুদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও ক্ষমতা নির্ভর করত। ফলে সামন্ত প্রভুরা প্রতিবেশী সামন্তদের অধীনস্থ জমি ও কৃষকদের যুদ্ধের মাধ্যমে নিজ দখলে আনতে সচেষ্ট ছিলেন। ফলে, সামন্ত প্রভুদের মধ্যে স্থানীয় যুদ্ধ লেগে থাকা মধ্যযুগের একটি স্থায়ী লক্ষণ ছিল। এই যুদ্ধগুলোতে গ্রাম ও শহর পুড়িয়ে ফেলা হত, সাধারণ মানুষদের হত্যা করা হত, শষ্য ও গবাদি পশুদের হরণ বা ধ্বংস করা হত। ফলে, সমাজের অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যাহত হত। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হত কৃষকশ্রেণী।

সামন্তপ্রভুরা সাধারণতঃ বাস করতেন প্রস্তর নির্মিত প্রাসাদ দুর্গে। প্রধানতঃ উঁচু টিলার ওপর প্রাসাদ দুর্গ নির্মিত হত এবং গড়খাই ও পুরু উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা থাকত। প্রাসাদ-দুর্গে প্রবেশের জন্য গড়-খাই-এর ওপর সাধারণতঃ একটা সেতু থাকত। সেতুটিকে ইচ্ছে মত ওঠানো ও নামানো যেত এবং এই সেতুটিই দরকার মত প্রাসাদ ও বাইরের জগতের মধ্যে যোগাযোগ রাখত। প্রাসাদ দুর্গের আশেপাশে কৃষক
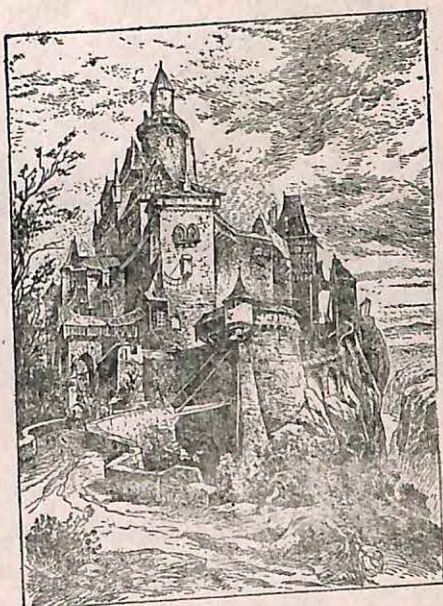
প্রাসাদ দুর্গ

প্রজারা বাস করত। শত্রুর আক্রমণের সময় বা বিপদকালে প্রজারা প্রাসাদদুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করত।

মধ্যযুগের ইতিহাসে অশ্বারোহী, বর্মাবৃত সশস্ত্র নাইটদের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। অপরাপর সামন্তপ্রভু ও বিদেশী শত্রুদের দ্বারা অধীনস্থ কৃষকপ্রজারা যাতে লুণ্ঠিত না হয় তার জন্য তাঁরা সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন এবং আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতেন। নিয়মিত অর্থনৈতিক উৎপাদন বজায় রাখার জন্য শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা ছিল অত্যন্ত জরুরী। মধ্যযুগের ইওরোপকে আরব আক্রমণকারীদের হাত থেকে, জলদস্যুদের অত্যাচার থেকে এবং পূর্ব ইওরোপের বর্বরদের হাত থেকে রক্ষার জন্য নাইটরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

নাইট

শুধু মাত্র যোদ্ধা হিসেবে কর্তব্য পালন করেই তাঁরা ক্ষান্ত থাকেননি। রাজ ক্ষমতার প্রতিনিধিরূপে আরও বহু তাঁরা দায়িত্ব পালন করতেন। তাঁরা ছিলেন নিজ নিজ এলাকায় একাধারে বিচারক ও শান্তি রক্ষক। পথিক, বণিক ও তীর্থযাত্রীদের দস্যুদলের হাত থেকে রক্ষা করা ছিল তাঁদের কর্তব্য। সেচ বাঁধগুলোর প্রতি তাঁরা সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। নিজ এলাকার গীর্জা ও মঠগুলো রক্ষার দায়িত্বও তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। নিজ এলাকার জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের সঠিক হিসেবে রাখবার জন্য তাঁরা পুরোহিতদের নিয়োগ করতেন। এইভাবে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করে, সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রেখে তাঁরা মধ্যযুগের ইওরোপীয় সভ্যতাকে রক্ষা করেছিলেন।

মধ্যযুগের সামন্তপ্রভুদের জমিদারীগুলো অর্থনৈতিক জীবনের কেন্দ্র হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক জীবনেরও কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। সামন্তপ্রভুরা নিজ নিজ এলাকায় জনসাধারণ আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ করলে

তাদের বিচার করা এবং শাস্তিদান করার ক্ষমতা নিজেদের হাতে গ্রহণ
করেছিলেন। যোদ্ধারূপে সশস্ত্র অনুচরের দল নিযুক্ত করার ক্ষমতাও
তাঁরা স্বহস্তে গ্রহণ করেছিলেন। নিজেদের প্রয়োজন বা খেয়াল খুশীমত
ভূমিদাসদের ওপর কর ধার্য করবার ক্ষমতাও তাঁদের ছিল। সামন্ত-
প্রভুরা যেহেতু যোদ্ধাশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, সেহেতু প্রয়োজন মত
ভূমিদাসদের আদেশ পালনে বাধ্য করবার মত উপায়ও তাঁদের হাতে
থাকত। সামন্তপ্রভুরা যখন এইভাবে তাঁদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে
চলেছিলেন, তখন তাঁদের বাধা দেবার ক্ষমতা রাজাদের ছিল না।
এমন কি কখনো কখনো রাজারা সামন্ত প্রভুদের ব্যক্তিগত ক্ষমতালাভে
উৎসাহ দিতেন। কারণ, সে যুগে অর্থনীতি ছিল একান্তই ভূমি নির্ভর
এবং ব্যবসা বাণিজ্য ছিল অত্যন্ত অনগ্রসর। এই অবস্থায় বিশ্বস্ত
সেবকদের পুরস্কৃত করবার একমাত্র পথ ছিল তাঁদের ভূমি এবং
নিজেদের লাভের জন্য স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে খাজনা ও
প্রাপ্য আদায় করার অধিকার দান করা। এইভাবে নিজ এলাকার
মধ্যে সামন্তপ্রভুরা শুধুমাত্র ভূস্বামীই ছিলেন না, প্রশাসন ও আইন
সংক্রান্ত ক্ষমতাও তাঁরা নিজেদের হাতে রাখতেন।

এইভাবে দেখা যায়, মধ্যযুগের ইউওরোপের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য
ছিল সামন্তপ্রথায়। সামন্ত প্রথায় সংগঠিত সমাজের ছবিই ছিল সমগ্র
মধ্যযুগের ছবি। সমাজ ছিল দুভাগে বিভক্ত। সামন্তপ্রভুরা শাসক
ও প্রতিরক্ষার কাজে নিযুক্ত ছিলেন এবং ভূমিদাসরা কৃষি উৎপাদনের
কাজে নিযুক্ত ছিল। সমগ্র শাসক শ্রেণী ছিলেন পদ মর্যাদার ক্রমবিশিষ্ট
পিরামিডে মত। জনগণকে শোষণ করবার অভিন্ন স্বার্থে তাঁরা
ঐক্যবদ্ধ ছিলেন। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সকল অধিকার
সামন্তপ্রভুরা ভোগ করতেন। জনগণের কোন অধিকার ছিল না।
সামন্ত প্রভুদের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, অধিকার ও
কর্তব্যের বিধিবদ্ধ নিয়ম ছিল। প্রত্যেক সামন্ত তাঁর উর্দ্ধতন সামন্তের
সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখতেন, যার প্রয়োজন মেটাতে তিনি বাধ্য
থাকতেন। উর্দ্ধতন সামন্তের বড় ছেলের নাইট হওয়া বা বড় মেয়ের

বিয়ে উপলক্ষ্যে ছোট সামন্তকে নিজ অবস্থানুযায়ী একটা কর দিতে হত। এছাড়া নানারকম সেলামী দেবারও প্রথা ছিল। অপরপক্ষে উর্দ্ধতন সামন্তের কর্তব্য ছিল ছোট সামন্তকে রক্ষা করা, তার প্রতি সুবিচার করা এবং আইনের সাহায্য ছাড়া তাকে তার সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত না করা। উর্দ্ধতন প্রভুর দরবারে বিচারের সময় ছোট সামন্তকে সাহায্য করতে হত। যদি কোন সামন্ত উর্দ্ধতনের প্রতি দায়িত্ব সব পালন না করতে পারত, তবে উর্দ্ধতন প্রভু তাকে জমিদারী থেকে বঞ্চিত করতে পারতেন। সামন্তদের এই পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল আইন সিদ্ধ। কিন্তু সামন্তদের সঙ্গে ভূমিদাসদের যে সম্পর্ক ছিল তা ছিল নিছক প্রভু ভৃত্যের সম্পর্ক, শোষক ও শোষিতের সম্পর্ক। তার মধ্যে না ছিল সম্মান, না ছিল গৌরব, না ছিল কোনো মর্যাদা।

মধ্যযুগের সামন্ত-তান্ত্রিক জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল খ্রীষ্টিয় ধর্মাধিষ্ঠান। এর গঠনও ছিল সামন্ত-তান্ত্রিক। ধর্মাধিষ্ঠানের শীর্ষে ছিলেন পোপ, তাঁর নীচে ছিলেন বিশপরা। বিশপদের নীচে ছিলেন সাধারণ পাদরিরা। মধ্যযুগের ধর্মাধিষ্ঠান প্রচুর ভূ-সম্পত্তির মালিক ছিল। বড় বড় মঠের মঠাধ্যক্ষ এবং বিশপরা সামন্ত প্রভুদের মতই এইসব জমির ভূমিদাসদের শাসন ও শোষণ করত। এছাড়া ধর্মাধিষ্ঠান ধর্মের নামে কর আদায় করতেন এবং আলাদা বিচারালয়ের মাধ্যমে জনসাধারণের ওপর কর্তৃত্ব করতেন।

সামন্তযুগ ছিল বীরধর্মের যুগ। সামন্ত শ্রেণীর অলঙ্কার ছিল 'নাইট' নামে এক বীর সম্প্রদায়। সাধারণতঃ সামন্তদের ছেলেরা নাইট হত। নাইট হতে ইচ্ছুক ছেলেটিকে সাত আট বছর বয়সে একজন সামন্ত প্রভুর আজ্ঞাবহ শিক্ষানবীশরূপে রাখা হত। শিক্ষা শেষ হলে গীর্জাতে ধর্মযাজকের পরিচালনায় এক আড়ম্বপূর্ণ ধর্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সে নাইট উপাধি লাভ করত। ধর্মযাজকদের কাছে তাকে অকপটে সমস্ত পাপের কথা স্বীকার করতে হত; ধর্মযাজক তাকে নৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক ও সামরিক কর্তব্য সম্বন্ধে নানা উপদেশ

দিতেন। সে সব উপদেশ পালন করবার শপথ গ্রহণ করত। এবং তারপর কাঁধে একখানা তলোয়ার নিয়ে গীর্জায় বেদীর কাছে উপস্থিত হলে ধর্মযাজক তার তলোয়ারটিকে মন্ত্রপুত করে দিতেন। তখন সে পাশে উপবিষ্ট প্রভুর কাছে নাইট উপাধি প্রার্থনা করলে প্রভু তাকে বলতেন—'তুমি যদি সম্পদে, বিলাসে ও আরামে দিন কাটাতে চাও, তবে তুমি ওই সম্মানের অযোগ্য।' তখন সে বিনীতভাবে আবার নাইট উপাধি চাইলে, অন্যান্য নাইটরা এবং মহিলারা তাকে অস্ত্রে ও বর্মে সজ্জিত করে দিত। তখন তার প্রভু তাকে যুদ্ধাস্ত্র প্রদান করে বলতেন, "ঈশ্বরের নাম, সেন্ট মাইকেল ও সেন্ট জর্জের নাম স্মরণ করে আমি তোমাকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করলাম।" এইভাবে নাইট উপাধিতে ভূষিত হয়ে সে অনুচরদের নানারকম উপহার দিত এবং বন্ধুবান্ধবদের ভোজ দিত।

নাইটদের আদর্শ ছিল সত্যের পূজারী, বীর, বিনয়ী ও নম্র হওয়া। সেবা ও কর্তব্যপরায়ণতার আদর্শে তাদের উদ্বুদ্ধ হতে হত। রাজা এবং খ্রীস্টধর্ম ও চার্চের প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য ছিল নাইটের আদর্শ। নারী এবং দুর্বলকে রক্ষা করা ছিল তাদের সামাজিক কর্তব্য। বীরত্ব বিশ্বস্ততা, আচার-আচরণ, রীতিনীতিতে নাইটদের আদর্শ জীবনযাপন করতে হত।

শিরস্ত্রাণ, ভারী বর্ম ইত্যাদি পরে এবং বর্শা, তলোয়ার ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নাইটরা ঘোড়ায় চড়ে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করে বেড়াত এবং তাদের কর্ত্তব্য করতেন। অবসর সময়ে শিকার, দ্বন্দ্বযুদ্ধ ইত্যাদিতে সময় কাটাত।

মধ্যযুগের প্রথমদিকে যুদ্ধের সময়ে বীরত্ব প্রসর্শনের পুরস্কার স্বরূপ কোন নাইট ইচ্ছে করলে অপর ব্যক্তিকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করতে পারত। তখন তলোয়ারের ভোঁতা দিক দিয়ে তার ঘাড়ে আঘাত করে সে বলত "আমি তোমায় 'নাইট' নামে ভূষিত করলাম।" পরে শান্তির সময়ে নাইট উপাধি দেবার প্রথা গড়ে ওঠে এবং ধর্মযাজকের সাহায্যে নাইট উপাধি দেবার ব্যবস্থা হয়।

নাইট প্রথার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যযুগে বীরত্ব কাহিনী খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। জার্মান, ফরাসী, ইতালীয়ান, স্প্যানিশ, ইংরেজী ভাষায় গ্রাম্য কবিরা নাইটদের ও বিখ্যাত রাজাদের বীরত্ব ও আত্মত্যাগের কাহিনী রচনা করেন। রাজা আর্থার, রবিন হুড, রোলাণ্ড প্রভৃতির বীরত্ব কাহিনী খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এইসব বীরগাথা এবং কাহিনী ছিল অনেকটা রাজস্থানের চারণগীতি বা বাংলার মঙ্গল কাব্যের মত। ভ্রাম্যমাণ চারণরা এইসব গাথা বিভিন্ন স্থানে গেয়ে বেড়াতেন। ফ্রান্সে এই চারণ কবিদের বলা হত **'ত্রুবেদর'** এবং জার্মানীতে বলা হত 'মিনেসিংগার'। সামন্ত প্রভুরা এদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। নাইটরা এদের চারণগীতি শুনে উদ্দীপ্ত হ'ত। মধ্যযুগে পণ্ডিতদের ভাষা ছিল ল্যাটিন। চারণ কবিদের বীরগাথা রচনা ও প্রচারের ফলে ফরাসী, জার্মান, ইতালীয়ান প্রভৃতি স্থানীয় ভাষাগুলোর যথেষ্ট উন্নতি হয়।

ম্যানর ব্যবস্থা (Manorial system):

কৃষি ও পশুপালন ছিল মধ্যযুগের ইওরোপে প্রধান উপজীবিকা। জমি ছিল আয়ের প্রধান উৎস। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় ইওরোপের প্রায় সকল জমি ছিল ছোট বড় জমিদারদের অধীনে। কৃষিজমি, অনাবাদী পতিত জমি, বন, নদী, পুকুর ইত্যাদি সকলই ছিল জমিদারদের সম্পত্তি। স্বাধীন কৃষক বলতে তখন কোন শ্রেণী ছিল না। জমিদার সামন্ত প্রভুরা এবং চার্চ ও মঠগুলো ছিলেন জমির মালিক অপরদিকে ভূমিদাস বা সার্ফ কৃষকগণ ছিল সাধারণ শ্রেণী। ভূমিদাসগণ ছিল জমির মালিকের অধীন। ইচ্ছানুসারে গ্রাম ছেড়ে চলে যাবার স্বাধীনতা না থাকায় তাদের ভূমিদাস বলা হত। সার্ফদের নিজস্ব কিছু কিছু জমি থাকত। সেই জমি চাষ করে তারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করত।

সামন্ততান্ত্রিক যুগে অধিকাংশ মানুষ বাস করত গ্রামে। সামন্ত প্রথায় সংগঠিত গ্রামকে বলা হত ম্যানর। প্রত্যেক সামন্ত প্রভুর

এক বা একাধিক ম্যানর থাকত। একাধিক ম্যানরের মালিকগণ পালা করে বিভিন্ন ম্যানরে বাস করতেন। এক ম্যানরের শস্যাদি
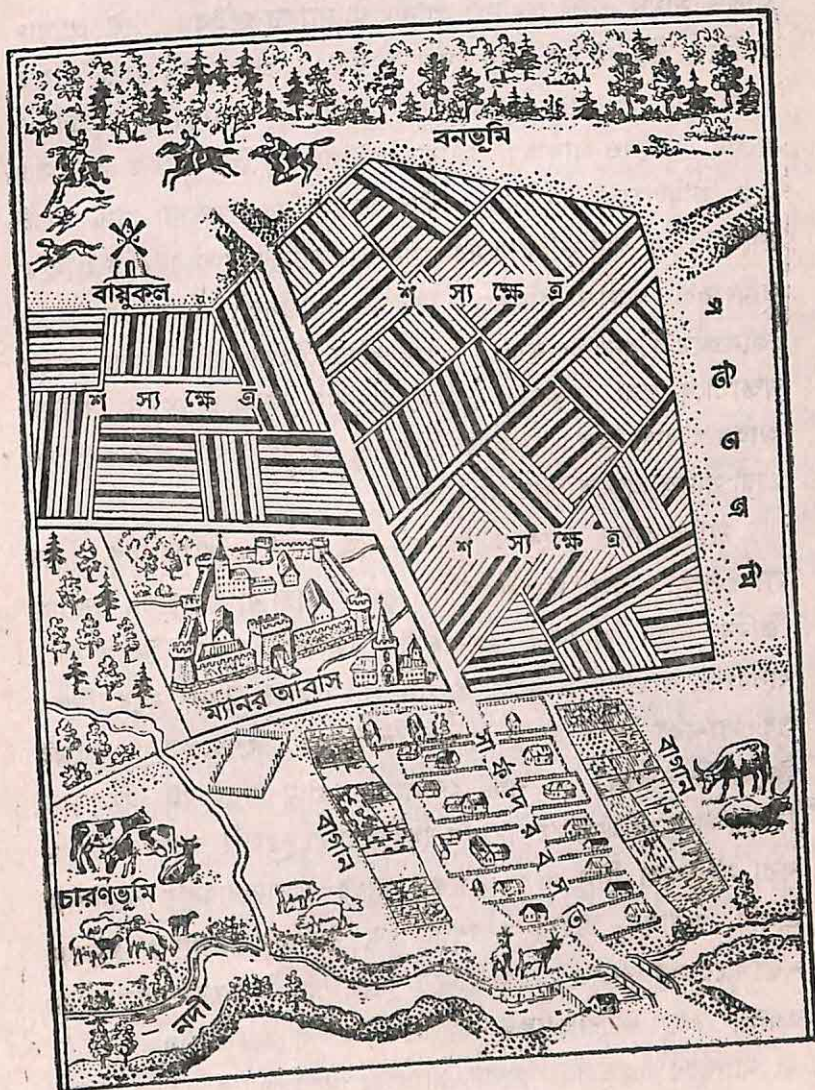
মধ্যযুগের ম্যানর পরিকল্পনা

শেষ হয়ে গেলে তারা চলে যেতেন অন্য অন্য ম্যানরে। মালিক ছাড়া ম্যানরের প্রধান অধিবাসী ছিল ভূমিদাসরা। ম্যানরের জমির

খানিকটা থাকত ম্যানরের মালিকের খাস দখলে, বাকীটা সার্ফ বা ভূমিদাস প্রজাদের হাতে। ম্যানরের মাঝখানে শ্রেষ্ঠ স্থানটিতে থাকত সামন্ত প্রভুর সুরক্ষিত প্রাসাদ বা **ম্যানর হাউস**। এই প্রাসাদ চতুর্দিকে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা থাকত। প্রাসাদের সংলগ্ন থাকত আস্তাবল, শস্যাগার, গোয়ালঘর ইত্যাদি। এছাড়া শাকসব্জী ও ফলের বাগানও থাকত। ম্যানর হাউসের চতুর্দিকে থাকত কৃষিক্ষেত্র এবং ভূমিদাসদের কুটির। ম্যানরের মালিক অসংখ্য ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করে ভূমিদাসদের মধ্যে জমি বণ্টন করতেন। সেই জমিতে ভূমিদাসরা অক্লান্ত পরিশ্রমে নিতান্ত অনগ্রসর প্রথায় চাষ করে, কোনক্রমে জীবনধারণ করত। খাস জমির উৎপন্ন ফসল সামন্ত প্রভুর শস্যাগারে জমা পড়ত। ভূমিদাসরা খাস জমিতে বেগার খাটতে আইনতঃ বাধ্য ছিল। এছাড়া নিজেদের জমির উৎপন্ন শস্যের ভাগও তারা সামন্ত প্রভুকে দিতে বাধ্য ছিল।

ম্যানর প্রথার বিশেষত্ব ছিল এই যে, কৃষি ও শিল্পের দিক দিয়ে ম্যানরগুলো ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। নুন, লোহা বা ঐ ধরনের দুষ্প্রাপ্য জিনিষ ছাড়া আর সব প্রয়োজনীয় জিনিসই ম্যানরে উৎপন্ন হত। বাসনপত্র, জামাকাপড় জুতো ইত্যাদি ভূমিদাসরাই তৈরী করে নিত। সব ম্যানরেই প্রায় একই ধরনের জিনিষপত্র উৎপন্ন হত। কাজেই উদ্বৃত্ত জিনিষপত্র বা শস্য কেনাবেচা প্রায় দরকারই হত না। বিভিন্ন ম্যানরের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা বা দূরবর্তী স্থানে যাতায়াত করা সহজসাধ্য ছিল না। কাজেই ম্যানর প্রথায় ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসার ঘটেনি। উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য এবং জিনিষপত্র সামন্ত প্রভুদের শস্যাগারে জমা থাকত। অপরদিকে ভূমিদাসরা কোনক্রমে গ্রাসাচ্ছাদন করত। ফলে কারো হাতেই নগদ টাকা বিশেষ থাকত না।

ম্যানরের প্রভুরাই ছিলেন ম্যানরের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। ম্যানরের আভ্যন্তরীণ শাসনের বিষয়ে, সমস্ত ক্ষমতা ছিল ম্যানরের প্রভুর হাতে। ভূমিদাসদের বিচার করবার এবং শাস্তি দেবার ক্ষমতা তাদের ছিল। অপরাধের জন্য কাছারিতে জরিমানা আদায় ছিল সামন্ত প্রভুদের লাভের

একটি বড় উপায়। ভূমিদাসরা জমি ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করলে বা পালিয়ে ধরা পড়লে, সময় মত সামন্ত প্রভুরা পাওনা মেটাতে পারলে বা কাজে অবহেলা করলে সামন্ত প্রভুরা তাদের বিচার করতেন ও শাস্তি দিতেন।

অর্থনৈতিক অবস্থা : মধ্যযুগের চাষের ধরণ ছিল অনুন্নত। লাঙল ও সার দেবার উন্নত প্রথা ছিল না। ফলে ফসলের পরিমাণ ছিল সামান্য। ভূমিদাসদের প্রায় অর্ধেক সময় প্রভুর জমিতে চাষবাসে ব্যস্ত থাকতে হত। প্রভুর খাস জমিতে তারা বেগার খাটত বা বিনা মজুরীতে চাষ করত, অন্য কাজ করত এবং ফরমাস খাটত। প্রভুর জমিচাষের কাজে ভূমিদাসরা যাতে অবহেলা করতে না পারে সেজন্য প্রভুর কর্মচারীগণ সর্বদা লক্ষ্য রাখত। প্রভুর জমিতে অধিকাংশ সময় ব্যস্ত থাকার ফলে, ভূমিদাসরা অনেক সময় নিজেদের জমির কাজ ভালভাবে করতে পারে না। প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে প্রভুর জমির ফসল বাঁচানো তাদের প্রধান কর্তব্য ছিল। সেই সময় তাদের নিজস্ব জমির ফসল নষ্ট হলেও তাদের সেটা সহ্য করতে হত। ম্যানরের সমগ্র কৃষিযোগ্য জমিতে একই সঙ্গে চাষ হত না। জমির উর্বরা শক্তি বাড়াবার জন্য পর্যায়ক্রমে কিছু জমি অনাবাদী বা পতিত রাখা হত। কাজেই অনুন্নত চাষের পদ্ধতি, জমিদার প্রভুর জমিতে বেগার খাটা এবং কিছু জমি অনাবাদী থাকার ফলে উৎপন্ন ফসলের
বেগার খাটা এবং কিছু জমি অনাবাদী থাকার ফলে উৎপন্ন ফসলের
পরিমাণ ছিল কম। ভূমিদাসরা অক্লান্ত পরিশ্রমে কোন ক্রমে ভরণপোষণ করত।

ভূমিদাসদের নিকট জমিদার প্রভুর দাবির কোন অন্ত ছিল না। সামন্ততান্ত্রিক আইনানুসারে ভূমিদাস নিজ জমির উৎপন্ন শস্যের কিছু ভাগ জমিদার প্রভুকে দিতে হত। এছাড়া, নতুন প্রজাকে জমি নেবার আগে নজর দিতে হত, জমিদারের রাস্তা বা সাঁকোয় চড়লে কর দিতে হত। জমিদারের যাঁতাকলে অর্থের বিনিময়ে গম পেষাই করতে হত; সময়ে-অসময়ে নানা ভেট দেবার রীতিও ছিল। জমিদারের বাড়ীঘর তৈরী ও সংস্কার, জমিদারের রাস্তা ও সাঁকো তৈরী ও সংস্কার ইত্যাদি

বহু কাজ বিনা পারিশ্রমিকে করতে হত। তাছাড়া, জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ করা, কাপড় বোনা, ডিম, মখন, মধু, চামড়া ইত্যাদি সংগ্রহ করাও তাদের কাজ ছিল। এমন কি জমিদারের বিনা অনুমতিতে ভূমিদাসদের বিবাহ করবার স্বাধীনতাও ছিল না। কোন ভূমিদাসের মৃত্যু হলে তার পুত্রকে উত্তরাধিকার পাবার জন্যে জমিদার প্রভুকে শ্রেষ্ঠ গাভীটি দিতে হত। জমিদার প্রভুরা ঘোড়ায় চড়ে সদলবলে তাদের শস্যক্ষেত্রের ওপর দিয়ে শিকারে গেলে তারা প্রতিবাদ করতে পারত না নীরবে তাদের ক্ষতি সহ্য করতে হত।

জমিদারের অন্তহীন পাওনা ছাড়াও ভূমিদাসরা চার্চের পাওনা মেটাতে বাধ্য ছিল। মধ্যযুগে ইওরোপে চার্চ ছিল সব চাইতে বড় জমিদার। দেশের অনেক জমিই ছিল বিশপ ও মঠগুলোর হাতে। বিশপ বা পাদ্রীগণ ও মঠাধ্যক্ষগণ সামন্ত প্রথায় সেইসব জমি ভূমিদাসদের মধ্যে বিলি করত এবং সামন্ত প্রভুদের মতই ভূমিদাসদের শোষণ করত। সব ভূমিদাসকেই ধর্মীয় কর হিসেবে তার মোট আয়ের এক-দশমাংশ চার্চকে দিতে হত। একে বলা হত **'টাইদ'**।

সামন্ত জীবন : সামন্ত প্রভুরা বাস করতেন ম্যানর হাউসে বা প্রাসাদ-দুর্গে। সাধারণতঃ উঁচু টিলায় এই প্রাসাদ-দুর্গ নির্মিত হত এবং জলপূর্ণ পরিখা বেষ্টিত থাকত। এই পরিখার ওপর একটা সেতু থাকত। সেটাকে ইচ্ছে মত নামানো ওঠানো যেত। প্রাসাদ-দুর্গগুলো সাধারণতঃ পাথরের তৈরী এবং জমকালো চেহারার মত। পুরু উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা থাকত প্রাসাদ-দুর্গ। শত্রুর ওপর নজর রাখবার জন্য এবং প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে কয়েকটি উঁচু স্তম্ভ তৈরি করা হত। প্রাসাদের ভেতরে থাকত কয়েকখানা শোবার ঘর ও মাঝখানে একটা বিরাট হল ঘর। এছাড়া থাকত বড় গোলা ঘর, যেখানে দীর্ঘদিনের জন্য খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষ মজুত থাকত। শত্রু কর্তৃক অবরুদ্ধ হলে এই মজুত সম্ভার বিশেষ প্রয়োজন মেটাত। প্রাসাদ দুর্গের মধ্যেই জলের কুয়ো থাকত। এছাড়া বন্দী বা অপরাধীদের জন্য থাকত ভূ-গর্ভস্থ বন্দীশালা। বিপদের সময় প্রাসাদের

বাইরে যাবার জন্য নিকটবর্তী নদী বা বন পর্যন্ত গোপন সুড়ঙ্গ পথ থাকত। তখনকার দিনে মশালই আলো যোগাত। সুতরাং প্রাসাদের ভেতর একটা অন্ধকারময় থমথমে ভাব থাকত। ঘরের দেয়ালগুলোতে নানা রকম নক্সা করা সুন্দর পর্দা ঝোলানো থাকত। আসবাবপত্র বেশী থাকত না। তবে মাঝে মাঝে কোন কোন প্রাসাদের সুন্দর আসবাবপত্র মালিকের রুচির পরিচয় দিত।

সামন্ত প্রভুদের কাছে বিদ্যেবুদ্ধির থেকে শারীরিক শক্তির মূল্য ছিল বেশী। তাঁরা অধিকাংশই ছিলেন উদ্ধত ও অশিক্ষিত। পেশাদার ভাঁড়দের স্থূল হাস্যকৌতুক উপভোগ করতে তাঁরা ভালবাসতেন। মাঝে মাঝে বিরাট ভোজের আয়োজন হত, হাস্যকৌতুক, নাচ-গান, কুস্তি কসরত সব কিছুরই বন্দোবস্ত থাকত। পশমের মোটা পোশাক তাঁরা পরতেন। খেতেন মাছ, মাংস, ডিম, পেয়াজ, বাঁধাকপি, শশা, গাজর প্রভৃতি সবজি এবং আপেল, চেরী, পেয়ারা প্রভৃতি ফল। ভোজের আসরে প্রচুর মদ্যপান করা হত। শূয়োর, ষাঁড়, হরিণ ও নানারকম পাখী প্রায় আস্ত রান্না করা হত। ছুরি কাঁটার ব্যবহার তখনও চালু হয়নি। আঙ্গুল ও কাঠের চামচ দিয়েই খাওয়া হত। আমোদ-প্রমোদের মধ্যে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ ও শিকারই ছিল সামন্তদের কাছে সবচেয়ে প্রিয়। নানা-রকম অস্ত্র চালনার প্রতিযোগিতা খুব প্রচলিত ছিল। তীর ছোড়া অভ্যাস করা একাধারে প্রমোদ ও প্রয়োজনীয় কাজ বলে গণ্য হত।

প্রাসাদ-দুর্গে বসবাসকারী সামন্ত প্রভুরা ভূমিদাসদের ঘৃণা ও অনুকম্পার চোখে দেখতেন। তাঁরা নিজেদের আভিজাত্য ও বংশমর্যাদা নিয়ে গর্ব করতেন।

মধ্যযুগের সমাজ তিনভাগে বিভক্ত ছিল। অভিজাত সামন্ত প্রভু, যাজক শ্রেণী ও সাধারণ মানুষ। সামন্ত প্রভুদের মত যাজক শ্রেণীও ছিল অধিকারভোগী শ্রেণী। পোপ ছিলেন খ্রীস্টান জগতের ধর্মগুরু। সমস্ত ইওরোপের মানুষের ওপর তাঁর ছিল অখণ্ড আধিপত্য। রাজা বা সামন্ত প্রভুরা শুধু প্রজাদের আনুগত্য পেতেন; ধর্মের প্রধানরূপে পোপ পেতেন রাজা, প্রজা, সকল মানুষের আনুগত্য। সমগ্র ইওরোপের

ধর্মীয় শাসন পরিচালনা করতেন পোপ বিভিন্ন যাজকদের সাহায্যে। পদমর্যাদা অনুসারে এঁরা আর্চবিশপ, বিশপ, প্রীষ্ট ইত্যাদি নামে অভিহিত হতেন। মধ্যযুগে যাজকশ্রেণীর নির্দেশ অমান্য করার শক্তি কারো ছিল না। খ্রীস্টান চার্চ ছিল মধ্যযুগে জমির সবচেয়ে বড় মালিক। ইওরোপের প্রায় অর্ধেক জমি ছিল চার্চের অধীনে। সামন্ত প্রথায় যাজকরা সেইসব জমি ভূমিদাসদের মধ্যে বিলি করতেন। ভূমিদাসদের অত্যাচার ও শোষণের বিষয়ে সামন্ত প্রভু ও যাজকশ্রেণীর মধ্যে কোন ভেদ ছিল না। এছাড়া যাজকরা ধর্মের নামে অতিরিক্ত কর আদায় করতেন। ম্যানর প্রভুদের কাছারি আদালতের মতো গীর্জারও আলাদা বিচারালয় ছিল। যাজকশ্রেণী ছিলেন সাধারণতঃ ধনী, অত্যাচারী ও দুর্নীতিপরায়ণ। মধ্যযুগে বলা হত, জমি ছাড়া প্রভু নেই, প্রভু ছাড়া জমি নেই। যাজক এবং সামন্ত প্রভুরাই ছিল মধ্যযুগের মালিক শ্রেণী। অপরদিকে, সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাধীন কৃষকের সংখ্যা ছিল একেবারেই নগণ্য। প্রায় সকলেই ছিল ভূমিদাস। এরা পরিচিত ছিল 'সার্ফ' বা 'ভিলিন' নামে। যাজক ও সামন্ত প্রভুরা দিন কাটাতেন বিলাস ও আড়ম্বরে। অপর দিকে, ভূমিদাসরা অক্লান্ত পরিশ্রমে সমাজের সকল অর্থনৈতিক উৎপাদন করত। কিন্তু তারা দিন কাটাত চরম দারিদ্রের মধ্যে।

ভূমিদাস শ্রেণী ঃ সামন্ত সমাজের সর্ব নিম্নস্তরে ছিল ভূমিদাস বা সার্ফরা। মধ্যযুগীয় সমাজে ভূমিদাসরা চাষ করত, খাদ্য উৎপাদন করত, সমাজকে বাঁচিয়ে রাখত। এই ভূমিদাসদের উদ্ভব হল কি করে? রোম সাম্রাজ্যে ক্রীতদাসরাই ছিল প্রধান মজুর শ্রেণী। রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর সমগ্র সমাজে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তখন সমাজে শ্রমিকের অভাব দেখা দেয়। ফলে মালিক শ্রেণী খাদ্যোৎপাদন ও অন্যান্য কাজ করার জন্য ক্রীতদাসদের এক এক টুকরো জমি বন্দোবস্ত দিত। বন্দোবস্ত দেওয়ার ফলে জমিটুকুর ওপর চাষীর কিছুটা অধিকার থাকলেও মালিক ইচ্ছে করলেই জমি থেকে তাদের উচ্ছেদ করে দিতে পারতেন। ক্রমে এই অনিশ্চিত মালিকানা কিছুটা

বিধিবদ্ধ হয় এবং ক্রীতদাসরা ভূমিদাস শ্রেণীতে পরিণত হয়। ঋণের দায়েও বহু স্বাধীন কৃষক ধীরে ধীরে ভূমিদাসে পরিণত হয়। ভূমিদাসরা ছিল মালিকদের অস্থাবর সম্পত্তি। কতকগুলো কাজ ও পাওনার প্রতিশ্রুতিতে মালিকরা ভূমিদাসদের ফালি ফালি জমি বন্দোবস্ত দিতেন। যদি ভূমিদাসরা এই কাজগুলো না করত বা পাওনা না মেটাত তাহলে মালিক তাকে শুধু জমি থেকে নয়, ম্যানর অর্থাৎ গ্রাম থেকে দূর করে দিতেন। কিন্তু প্রতিশ্রুতিগুলো ছিল সম্পূর্ণ একতরফা; অর্থাৎ মালিক ভূমিদাসের কিছু করবার প্রতিশ্রুতি দিতেন না। ভূমিদাসরা কিন্তু ইচ্ছে মত প্রভুর জমি ছেড়ে চলে যেতে পারত না। প্রভু যদি তাঁর জমি অন্য কোন মালিককে বিক্রি করে দিতেন, তাহলে ভূমিদাসসুদ্ধ বিক্রি করতে হত অর্থাৎ ভূমিদাসদের আর এক নতুন প্রভু হত।

ভূমিদাসদের কাছ থেকে জমির মালিকদের পাওনা ছিল অনেক। নানারকম কর দেওয়া ছাড়াও মালিকের খাস জমিতে সপ্তাহে দু'তিন দিন বাধ্যতামূলক বেগার খাটতে হত। ভূমিদাসদের ছেলেমেয়ের বিয়ে যদি অন্য কোন ম্যানরের মালিকের ভূমিদাসদের পরিবারে ঠিক হত, তাহলে বিয়ের আগে মনিবের অনুমতি দরকার হত। কোন ভূমিদাস মারা গেলে তার উত্তরাধিকারীকে একটা কর দিয়ে তবে জমির অধিকার পেতে হত। তাছাড়া, পয়সা দিয়ে মালিকের উনোনে রুটি তৈরী করতে হত। মালিকের কলেই গম ভাঙ্গাতে হত, মালিকের মাড়াই কলেই আঙুর মাড়াই করে মদ তৈরী করতে হত। মালিকের আদালতে তাদের বিচার হত। অতি সামান্য অপরাধে গুরু অর্থদণ্ড হত।

খড়ের চালে ঢাকা নড়বড়ে খুপরিতে ভূমিদাসরা বাস করত। ঘরে জানালার কোন বালাই ছিল না। মেঝেটা হত মাটির। ধোঁয়া বেরুবার জন্য চালে একটা ফোকর থাকত। বৃষ্টি হলে সেখান থেকে জল পড়ে ঘরের ভেতরটা ভিজে যেত। ঘরে আসবাবপত্র বলতে কিছুই থাকত না। তাদের সম্পত্তি বলতে চাষের কিছু আদিম যন্ত্রপাতি, কয়েকটা শূয়োর, গরু বা হয়ত একটা ঘোড়া। ভূমিদাসদের বাড়ীর মেয়ে এবং শিশুদের প্রচুর পরিশ্রম করতে হত। চাষের কাজে সাহায্য করা, সুতো কাটা,

কাপড় বোনা, বনের কাঠ সংগ্রহ করা ইত্যাদি কাজ তাদের করতে হত। ভাল খাবার, ভাল পরিচ্ছদ জুটত না।

ভূমিদাসদের কুটীর

ভূমিদাসরা তাদের পরিবার নিয়ে একই জায়গায় বাস করত, একই জমি চাষ করত। বংশানুক্রমে তারা ছিল মালিক প্রভুর সম্পত্তি। সাধারণভাবে ভূমিদাসত্ব থেকে মুক্তি বা স্বাধীনতার কোন প্রশ্নই ছিল না।

ভূমিদাসরা কিন্তু সব সময়েই নিজেদের ভাগ্যকে সহজে মেনে নিতে চাইত না। তারা বংশানুক্রমিক দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্তি খুঁজত। কিন্তু মুক্তির উপায় খুব সহজ ছিল না। কখনো কখনো তারা পালিয়ে গিয়ে কোন সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে যোগ দিত। কখনো বা দূরবর্তী কোন শহরে ছদ্মবেশে লুকিয়ে থাকত। শহরের শিল্প বা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে তারা জীবিকার সন্ধান করত। সাধারণতঃ এক বছর ও একদিন শহরে ছদ্মবেশে লুকিয়ে থাকতে পারলে আইনতঃ সে দাসত্ব থেকে মুক্তি পেত। এছাড়া তাদের মুক্তির আরও একটি উপায় ছিল সামন্ত প্রভুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা। একই জায়গায় বসবাস করবার ফলে এবং একই ধরনের অত্যাচারের শিকার হবার ফলে তাদের মধ্যে সহজেই ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে

উঠত। যৌথভাবে তারা ম্যানর মালিকের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করত। তাদের অস্ত্রশস্ত্র ছিল কাস্তে, কুঠার, লাঠি ইত্যাদি। দলবদ্ধভাবে তারা ম্যানর মালিকের খাস জমির শস্য নষ্ট করত, ম্যানর-হাউস আক্রমণ করত; কখনো বা ম্যানর মালিককে হত্যা করত। এই ধরনের বিদ্রোহগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইংলণ্ডে ওয়াট টাইলারের নেতৃত্বে এবং ফ্রান্সে জাকুরির নেতৃত্বে কৃষক বিদ্রোহ। বিদ্রোহ অনেক সময় ব্যাপক আকার ধারণ করত। এইভাবে তারা সামন্ত প্রভুদের অত্যাচার প্রতিরোধ করতে চাইত। সমগ্র মধ্যযুগে সামন্ত প্রভুদের সঙ্গে শোষিত ভূমিদাসদের এই ধরনের বিভিন্ন সংগ্রাম চলেছিল।

অনুশীলনা

১। সামন্ত-সমাজের উদ্ভব কিভাবে ঘটে? সামন্ত-সমাজের শ্রেণীবিভাগ বর্ণনা কর?

২। মধ্যযুগের ইতিহাসে সশস্ত্র নাইটদের কিরূপ ভূমিকা ছিল?

৩। ম্যানর কাকে বলে? ম্যানর ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৪। ম্যানরের কৃষি ব্যবস্থা কিরূপ ছিল? ম্যানরের সার্ফদের কাছে প্রভুর কি কি পাওনা হত?

৫। ম্যানরে সামন্ত প্রভুদের জীবনযাত্রার বিবরণ দাও।

৬। ভূমিদাস কাদের বলা হত? ভূমিদাসদের অবস্থার বর্ণনা দাও।

৭। ভূমিদাসরা কিভাবে দাসত্ব থেকে মুক্তি খুঁজত?

৮। কম কথায় উত্তর দাও :

(ক) সামন্ত সমাজে সামাজিক স্তর বিভাগ কেমন ছিল?

(খ) ছোট সামন্ত ও বড় সামন্তের মধ্যে কিরূপ সম্পর্ক ছিল?

(গ) সামন্ত প্রভুরা কেন যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকতেন?

(ঘ) সামন্ত প্রভুদের প্রাসাদ দুর্গের বিবরণ দাও।

(ঙ) কিভাবে নাইট উপাধি লাভ করা যেত?

(চ) ক্রুবেদর কাদের বলা হত? এঁরা কি করতেন?

৯। টীকা লেখ :

(ক) ম্যানর হাউস, (খ) টাইদ, (গ) সার্ফ, (ঘ) ভিলিন।

অষ্টম অধ্যায়

॥ ক্রুসেড ॥
(The Crusades)

মধ্যযুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে **ক্রুসেড** বা ধর্মযুদ্ধ। খ্রীস্টানদের পুণ্য তীর্থক্ষেত্র প্যালেস্টাইন বিধর্মী তুর্কী মুসলমানদের হাত থেকে পুনরুদ্ধার করবার জন্য পোপের আহ্বানে ইওরোপের খ্রীস্টান সমাজ এক মরণপণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল। এই সংগ্রামই ধর্মযুদ্ধ বা **ক্রুসেড** নামে পরিচিত। এই ধর্মযুদ্ধ চলেছিল প্রায় দু'শ বছর ধরে। এই ক্রুসেড সংখ্যায় অনেকগুলো হলেও এদের প্রথম চারটিই উল্লেখযোগ্য।

ইওরোপের খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের প্রায় সকল শ্রেণীর লোকেরাই ক্রুসেডে অংশ গ্রহণ করেছিল। ভিন্ন ভিন্ন কারণে তারা ক্রুসেডে অংশ গ্রহণ করে। ক্রুসেডে অংশ গ্রহণের পটভূমিকা তৈরি হয়েছিল দীর্ঘদিন ধরে।

ক্রুসেডের পতাকাতলে ইউরোপীয় খ্রীস্টান জনসমাজকে সমবেত করার ব্যাপারে ক্যাথলিক গীর্জাগুলো এক গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা গ্রহণ করেছিল। মধ্যযুগে ধর্মপ্রাণ খ্রীস্টানদের রীতি ছিল যেখানে যীশু বাস করতেন এবং যেখানে তাঁর পবিত্র সমাধি মন্দিরটি অবস্থিত—সেই 'পবিত্রদেশ' প্যালেস্টাইনে তীর্থযাত্রা করা। ১০৭৬ খ্রীস্টাব্দে সেলজুক তুর্কীরা প্যালেস্টাইন অধিকার করে। সেলজুক তুর্কীরা ছিল ধর্মান্ধ। তারা খ্রীস্টান তীর্থযাত্রীদের ওপর অত্যাচার ও দুর্ব্যবহার করত। এই অত্যাচারের সংবাদ ইওরোপে ছড়িয়ে পড়লে ধর্মপ্রাণ খ্রীস্টানরা তুর্কীদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। এছাড়া, সেলজুক তুর্কীদের শক্তিবৃদ্ধি ও রাজ্যবিস্তার দেখে বাইজান্টাইন সম্রাটরা রীতিমত শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। তখন খ্রীস্টান ইওরোপের ধর্মনেতা ছিলেন

পোপ দ্বিতীয় আরবান। বাইজান্টাইন সম্রাট তাঁর কাছে তুর্কীদের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করলে, দ্বিতীয় আরবান ঘোষণা করেন **'ধর্মযুদ্ধ হোক এই-ই ঈশ্বরের ইচ্ছা।'** এইভাবে পোপের আহ্বানে পবিত্র দেশ প্যালেস্টাইন পুনরুদ্ধারের জন্য ক্রুসেডের সূচনা হয়েছিল। ক্রুসেড আহ্বান করে পোপ তাঁর নিজস্ব দুটি উদ্দেশ্য সাধন করতে চেয়েছিলেন। প্রথমতঃ ক্যাথলিক গীর্জার প্রভাব ও ক্ষমতা সম্প্রসারিত করা। দ্বিতীয়তঃ ইওরোপ থেকে বহু সংখ্যক নাইট সরিয়ে নিয়ে যাওয়া, যাঁরা সুযোগ পেলেই গীর্জার সম্পত্তি লুণ্ঠন করতেন।

কিন্তু **শুধুমাত্র ধর্মীয় কারণেই ক্রুসেড সুরু হয়নি। ক্রুসেডের অন্যান্য কারণও ছিল।** ইওরোপের বিভিন্ন শ্রেণী ও সামাজিক স্তরের প্রতিনিধিরা স্বদেশে নিজেদের ভাগ্য সম্বন্ধে সন্তুষ্ট না থেকে ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। ইওরোপের বিভিন্ন রাজা, সামন্ত প্রভু ইত্যাদি ধর্মযুদ্ধে যোগদান করেছিলেন পূর্ব ইওরোপে নতুন অঞ্চল অধিকারের আশায়। বিভিন্ন সূত্রে তাঁরা পূর্ব ইওরোপ ও এশিয়ার আরব রাজ্যগুলো অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কথা শুনেছিলেন। ক্রুসেডের সৈন্যবাহিনীর প্রধান অংশটি ছিল নাইটদের নিয়ে গঠিত। এঁরা ছিলেন অভিজাত ভূস্বামীদের কনিষ্ঠ পুত্রগণ যাঁরা উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার কাছ থেকে কোন ভূমি পেতেন না এবং যে কোন দুঃসাহসিক কাজের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ছিলেন। **এঁদের লুণ্ঠন প্রবৃত্তি ও সমৃদ্ধ পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলো অধিকারের ইচ্ছা ক্রুসেডের অন্যতম কারণ ছিল।**

সে যুগে পশ্চিম ইওরোপে কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল শোচনীয়। নানাধরনের করভারে তারা ছিল প্রপীড়িত। ১০৯৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১০৯৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত পর পর কয়েক বছর ভাল ফসল ফলেনি। ফলে কৃষকদের দুর্দশা বৃদ্ধি পায়। বহু কৃষক, যে ভূমির সঙ্গে তারা আইনতঃ আবদ্ধ ছিল, তা পরিত্যাগ করে অপেক্ষাকৃত কম কষ্টদায়ক জীবনের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছিল। যখন ক্রুসেডের জন্য সেনাবাহিনী সমাবেশ করা হচ্ছিল, তখন কৃষকরা দলে দলে পূর্বাঞ্চলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

বহু শহর, বিশেষ করে ইতালির শহরগুলো পূর্বাঞ্চলীয় বিলাস সামগ্রীর লাভদায়ক বাণিজ্য সম্প্রসারিত করার আশায় এই আন্দোলনে যোগদান করেছিল।

অপরদিকে, একাদশ শতাব্দীতে সমগ্র মুসলমান জগৎ বাগদাদ, কায়রো ও কর্ডোভার খলিফার মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। এদের মধ্যে কোন ঐক্য ছিল না। এই অনৈক্যের ফলে মুসলমান শক্তি অপেক্ষাকৃত দুর্বল হয়ে পড়ে।

এইভাবে বিভিন্ন ঘটনা ও কারণের ফলে একাদশ শতাব্দীতে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের সূচনা হয়েছিল।

প্রথম ক্রুসেডঃ ১০৯৫ খ্রীস্টাব্দে পোপ দ্বিতীয় আরবান প্রথম ক্রুসেডের কথা ঘোষণা করেন এবং যারা এতে অংশগ্রহণ করবে তারা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হবে এবং প্রচুর লুণ্ঠিত দ্রব্য পাবে —এই আশ্বাস দেন। ধর্ম-যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীরা তাদের পোষাকে পবিত্র ক্রুশচিহ্ন ধারণ করত। এইভাবে ধর্মযুদ্ধের নাম হয় ক্রুসেড। ইওরোপের কোন রাজা প্রথম ক্রুসেডে অংশ-গ্রহণ করেননি। নাইটদের দ্বারা পরিচালিত একটি সংগঠিত বাহিনী এতে অংশ-গ্রহণ করে। কিন্তু এরা অভিযান শুরু করার আগেই ধর্মপ্রচারক সন্ন্যাসী পিটার দরিদ্র কৃষকদের এক বাহিনী গঠন করেন। দীর্ঘদিন ধরে ইওরোপের দরিদ্র কৃষকদের ধর্মযুদ্ধে যোগ দিতে তিনি উৎসাহিত করেছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে সামান্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হাজার

ধর্মযোদ্ধারা যুদ্ধে লিপ্ত

হাজার দরিদ্র কৃষক হৈ হৈ করে ঘরবাড়ী ছেড়ে, পথে লুঠপাট করতে করতে কনস্ট্যান্টিনোপলে গিয়ে পৌঁছয়। সেখানেও তারা লুঠপাট করতে থাকে। বাইজাণ্টাইন সম্রাট তাদের সেখান থেকে সরিয়ে দেন। তারপর তারা যখন নাইসিয়া আক্রমণ করে, তখন তুর্কীরা তাদের প্রায় সকলকেই হত্যা করে। সন্ন্যাসী পিটার ও কয়েকজন কোন রকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসেন।

এরপর নাইটদের দ্বারা গঠিত সংগঠিত দলটি ১০৯৯ খ্রীস্টাব্দে জেরুজালেমে পৌঁছয়। ঝটিকাগতিতে তারা নগরটি দখল করে। সেখানকার মুসলমান অধিবাসীদের হত্যা করা হয়। **জেরুজালেমে একটি খ্রীস্টান রাজ্য গঠিত হল।** এছাড়া **ট্রিপলি, এডেসা** এবং **এণ্টিয়োক**—এই তিনটি স্থানেও তিনটি খ্রীস্টান রাজ্য গঠিত হল। এদের শাসক হলেন শক্তিশালী ইওরোপীয় অভিজাতগণ। পশ্চিম ইওরোপীয় সামন্ত শাসন ব্যবস্থার অনুকরণে একই ধরনের শাসনব্যবস্থা এখানে প্রচলিত হল। নবাগত ইওরোপীয় কৃষকরাও অর্থনৈতিক দাসত্বে আবদ্ধ হল। ফলে তাদের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হল না। স্থানীয় অধিবাসীরা বিদ্রোহ করায়, ১১৪৪ খ্রীস্টাব্দে ক্রুসেড যোদ্ধারা তাদের অন্যতম ঘাঁটি এডেসা হারায়। শহরটি পুনর্দখলের জন্য **দ্বিতীয় ক্রুসেডের** আয়োজন করা হয়। কিন্তু তা ব্যর্থ হয়।

তৃতীয় ক্রুসেডঃ ১১৮৭ খ্রীস্টাব্দে তুর্কী সুলতান সালাদিন (সালাউদ্দিন) জেরুজালেম শহর দখল করলে, শুরু হয় তৃতীয় ক্রুসেড। ক্রুসেডগুলোর মধ্যে এই তৃতীয় ক্রুসেডই সবচেয়ে বিখ্যাত। পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের জার্মান সম্রাট ফ্রেডরিক বারবারোসা, ইংলণ্ডের রাজা প্রথম রিচার্ড ও ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগাস্টাস তৃতীয় ক্রুসেডের নেতৃত্ব করেন। অপরদিকে ছিলেন অসাধারণ সামরিক প্রতিভা সম্পন্ন সুলতান সালাদিন। ৬৭ বছরের বৃদ্ধ সম্রাট ফ্রেডরিক প্রথমে অভিযান করেন। বৃদ্ধ বয়সে তাঁর এই উদ্যম দেখে খ্রীস্টান জগৎ তাঁকে দ্বিতীয় মোজেস নামে সম্মানিত করে। কিন্তু পথে তাঁকে সাংঘাতিক দুর্দশায় পড়তে হয় এবং শেষ পর্যন্ত তিনি জলে ডুবে মারা যান। রিচার্ড ও

ফিলিপের মধ্যে কোন সদ্ভাব ছিল না। ১১৯১ খ্রীস্টাব্দে তাঁরা একার অধিকার করেন। তারপর ফিলিপ অসুস্থ হয়ে দেশে ফিরে গেলে রিচার্ড একাই তৃতীয় ক্রুসেডের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। সাহস ও বীরত্বের জন্য রিচার্ড জনসাধারণের কাছে **'সিংহহৃদয়'** নামে পরিচিত
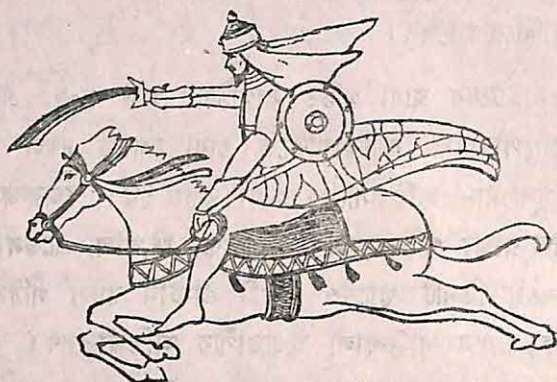
স্থলতান সালাদিন

ছিলেন। কিন্তু রিচার্ড জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করতে পারেন নি। তাঁর সৈন্যদল সংক্রামক জ্বরে আক্রান্ত হওয়ায় তিনি প্রত্যাবর্তনে বাধ্য হন। ১১৯১ খ্রীস্টাব্দে ব্যর্থতার মধ্যে তৃতীয় ক্রুসেড সমাপ্ত হয়। ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী বন্দর একার ধর্মযোদ্ধাদের দখলে আসে। উদার হৃদয় স্থলতান সালাদিন খ্রীস্টান তীর্থযাত্রীদের একার থেকে জেরুজালেমে তীর্থযাত্রায় অনুমতি দিয়েছিলেন।

চতুর্থ ক্রুসেড ঃ ক্রুসেডের ইতিহাসে চতুর্থ ক্রুসেড (১২০২—'৪ একটি হীন এবং ন্যক্কারজনক ঘটনা। পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট-এর আহ্বানে ধর্মযোদ্ধারা ফ্ল্যাণ্ডার্স, শ্যাম্পেন, ভেনিস প্রভৃতি শহর থেকে সমবেত হয়। জলপথে তারা যাত্রা শুরু করে। কিন্তু প্যালেস্টাইন অভিযানের পরিবর্তে তারা খ্রীস্টান রাজ্য হাঙ্গেরীর জারা বন্দরটি দখল করে এবং বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্ট্যান্টিনোপল লুণ্ঠন করে (১২০৪)। তিনদিন ধরে কনস্ট্যান্টিনোপলের খ্রীস্টান নাগরিকদের ও গীর্জার সম্পত্তি লুঠ করা হয়। বহু মূল্যবান শিল্পবস্তু ধ্বংস হয়।

১২০৪ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১২৬১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের কোন অস্তিত্বই ছিল না। ১২৬১ খ্রীষ্টাব্দ দুর্বল, শক্তিহীন বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৪৫৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কোন মতে অস্তিত্ব বজায় রাখার পর, তুর্কীদের আক্রমণে এই সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

চতুর্থ ক্রুসেডের ফলে প্রমাণিত হয়, লুণ্ঠন ও রাজ্যবিস্তার করা ছিল ধর্মযোদ্ধাদের উদ্দেশ্য, যীশুখ্রীষ্টের পবিত্র সমাধি মন্দির উদ্ধার করা নয়। ধর্মযুদ্ধ ও ধর্মীয় উন্মাদনার পরিবর্তে ধর্মযোদ্ধারা খ্রীস্টান শহর জারা দখল করেছিল। ভেনিসের অর্থনৈতিক স্বার্থের জন্য এই শহর দখল প্রয়োজন ছিল। বিপুল পরিমাণ ধনদৌলত লাভের আশায় বাইজান্টাইন রাজধানী কনস্ট্যান্টিনোপল লুণ্ঠন করা হয়েছিল। অল্পকালের মধ্যে তুর্কীরা ক্রুসেড-যোদ্ধাদের এশিয়া-মাইনর থেকে বিতাড়িত করে। ক্রুসেড যোদ্ধাদের শেষ ঘাঁটি একার শহর ১২৯১ খ্রীস্টাব্দে তুর্কীরা দখল করলে ক্রুসেডের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ইওরোপের নাইটরা ক্রুসেড থেকে যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের আশা পোষণ করছিল তা সফল না হওয়া সত্বেও ইওরোপীয় সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ক্রুসেডের প্রভাব ছিল অসামান্য। ইওরোপীয়রা পূর্বাঞ্চলের উন্নতর সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসেছিল। ক্রুসেডের একটি মস্ত বড় সুফল হল পরস্পরের ভাব বিনিময়। পশ্চিম ইওরোপের অধিবাসীরা দীর্ঘদিন ধরে পূর্ব ইওরোপীয় এবং আরব ও তুর্কী মুসলমানদের সংস্পর্শে আসে নানাভাবে। এই ভাবে গড়ে ওঠে এক সাংস্কৃতিক **সমন্বয়**। ধর্মীয় গোঁড়ামি ধীরে ধীরে কমে আসে। আরবদের উচ্চতর জ্ঞান বিজ্ঞানের সঙ্গে ইওরোপবাসীর পরিচয় ঘটে। শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, দর্শন ও বিজ্ঞানে দ্বাদশ শতাব্দীর ইওরোপে যে এক নবজাগরণ দেখা দেয়, তা ছিল কতকাংশে ক্রুসেড-লব্ধ নবজ্ঞানের ফলশ্রুতি। ক্রুসেডের কলহের মধ্যে দিয়ে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে এক মিলনের সেতু গড়ে ওঠে। উদার ও কুসংস্কারমুক্ত ইওরোপীয় মানসিকতা প্রঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের নবজাগরণের পটভূমিকা প্রস্তুত করে।

ইওরোপীয় সমাজজীবনে ক্রুসেডের ফল ছিল সুদূর প্রসারী। ভূমিহীন কৃষক বা সার্ফরা ক্রুসেডে যোগদান করে, দাসত্ব থেকে মুক্তি খুঁজত। ক্রুসেডের ফলে বিভিন্ন নগর ও শিল্প গড়ে ওঠায়, সার্ফরা দিনমজুরীর কাজে নিযুক্ত হতে থাকে। পরিবারের পুরুষ কর্তারা দীর্ঘদিন প্রবাসে থাকার ফলে নারীসমাজের দায়িত্ব বেড়ে যায় এবং নারীসমাজ অধিকতর স্বাধীনতা লাভ করে।

ক্রুসেডের ফলে ইওরোপে বাণিজ্যিক কার্যকলাপের প্রসার লাভ ঘটে। ক্রুসেডের টাকা, রসদ, জাহাজ ইত্যাদি যোগাড় করত বণিকেরা। তাদের উদ্দেশ্য ছিল পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে লাভজনক বাণিজ্যে অংশগ্রহণ। ক্রুসেডের ফলে পূর্বদেশে যাতায়াত খুব বেশী চলতে থাকে, তার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যও খুব বেড়ে যায়। ইতালির বণিকরা পূর্বদেশ থেকে রেশমী কাপড়, মণিমাণিক্য, রান্নার মশলা ইত্যাদি আমদানি করতে থাকে। ব্যবসা-বাণিজ্য চলত জলপথে। তাই সমুদ্র বা নদীতীরে বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে উঠতে থাকে। ইতালির ভেনিস জেনোয়া, পিসা ইত্যাদি বাণিজ্যকেন্দ্র রূপে প্রসিদ্ধিলাভ করে। বার্সিলোনো, মার্সেই, ভিয়েনা, লণ্ডন, ব্রিস্টল প্রভৃতি শহরও বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়। বণিক ও ব্যবসায়ী শ্রেণী প্রতিপত্তি লাভ করতে থাকে। অপরদিকে রক্ষণশীল সামন্ত প্রভুরা যুদ্ধবিগ্রহে নিজেদের শক্তিক্ষয় করে অবলুপ্তির পথে এগিয়ে চলে। এইভাবে ইওরোপের সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটে; এবং তার স্থান নেয় ধনতন্ত্র।

ক্রুসেডের ফলে ইওরোপীয়রা পূর্বাঞ্চলের উন্নত ভূমিকর্ষণ পদ্ধতি ও হস্তশিল্পে কারিগরী মান গ্রহণ করে। রেশম প্রস্তুত ও কাচের দ্রব্য নির্মাণও তারা শিক্ষা করেছিল। বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় ইওরোপে পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত প্রণালীতে পরিবর্তন দেখা দেয়। পূর্বে কৃষিই ছিল প্রধান অর্থনৈতিক উৎপাদন। কিন্তু ক্রুসেডের ফলে সমবেত হস্তোৎপাদন ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন কারিগরের মধ্যে কাজ ভাগকরা, তাদের কাজ একত্র করা, উপাদান যোগাড় করা ইত্যাদির ভার পড়ে ব্যবসায়ী বণিকদের ওপর। কারিগরের প্রস্তুত জিনিসের

বিক্রয়ের দায়িত্ব ছিল বণিকদের হাতে। এইভাবে গৃহজাত শিল্পের সূচনা হয়।

অনুশীলনী

১। কি কি কারণে ক্রুসেডের সূচনা হয়?

২। প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ ক্রুসেডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৩। ক্রুসেডের ফলাফল সংক্ষেপে বিবৃত কর।

৪। **কম কথায় উত্তর দাও ঃ**

(ক) ক্রুসেড কাকে বলে?

(খ) ইতালির শহরগুলো কেন ক্রুসেডে যোগদান করেছিল?

(গ) ক্রুসেড কবে শুরু হয়?

(ঘ) কত খ্রীস্টাব্দে ক্রুসেডের পরিসমাপ্তি ঘটে?

(ঙ) ক্রুসেডের ফলে ইতালির কোন কোন অঞ্চল বাণিজ্যকেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে?

(চ) ক্রুসেডের অন্যতম কারণ কি ছিল?

৫। **শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ**

(ক) ১০৯৬ খ্রীস্টাব্দে সেলজুক তুর্কীরা — অধিকার করে।

(খ) ১০৯৫ খ্রীস্টাব্দে ক্রুসেডের কথা ঘোষণা করেন পোপ —।

(গ) সাহস ও বীরত্বের জন্য রিচার্ড জনসাধারণের কাছে — নামে পরিচিত ছিলেন।

(ঘ) খ্রীস্টান জগৎ জার্মান সম্রাট ফ্রেডরিককে — নামে সম্মানিত করেছিল।

(ঙ) খ্রীস্টাব্দে তুর্কী সুলতান সালাদিন জেরুজালেম দখল করেন।

(চ) ধর্মযোদ্ধারা — খ্রীস্টাব্দে কনস্ট্যান্টিনোপাল লুণ্ঠন করে।

৬। **টীকা লেখ ঃ**

(ক) ক্রুসেড, (খ) সালাদিন, (গ) সিংহহৃদয়। (ঘ) সন্ন্যাসী পিটার।
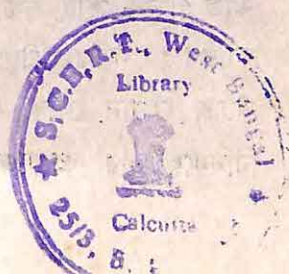
নবম অধ্যায়

॥ নগরের বিকাশ ॥

(**Growth of Towns**)

নগর ও নাগরিক জীবনই সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিকাশের কেন্দ্রস্থলে। প্রাচীন পৃথিবীতে নগরকে কেন্দ্র করেই উন্নত সভ্যতাগুলো গড়ে উঠেছিল। বর্বরদের হাতে রোম সাম্রাজের পতনের পর ইওরোপের নগরগুলোর পতন হয়। কয়েকটি শহর কোনমতে অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিল। মধ্যযুগের প্রথমদিকে ইওরোপে প্রকৃত শহর বলতে কিছুই ছিল না। দশম শতাব্দী থেকে ইওরোপে শিল্প বাণিজ্যের কেন্দ্ররূপে বিভিন্ন শহর গড়ে উঠতে থাকে।

মধ্যযুগীয় সমাজের ক্রমবর্ধমান চাহিদার ফলে কিছু কৃষক চাষবাসের অতিরিক্ত কিছু হাতের কাজ ও ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। ছুতোরের কাজ,
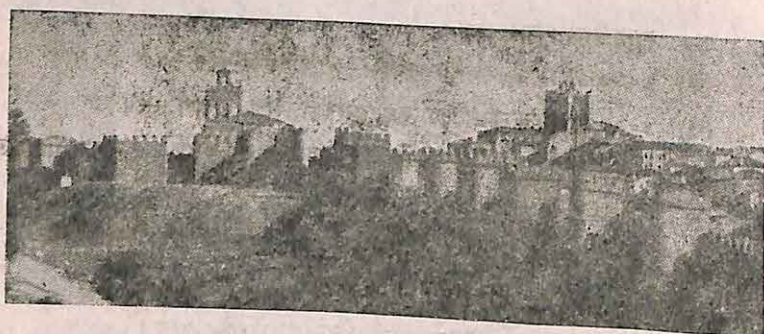
মধ্যযুগে প্রাচীরঘেরা স্পেনের একটি শহর

চামড়ারকাজ, কাপড় বোনা, মাটির জিমিষ তৈরী, কর্মকার ও দর্জির কাজ প্রভৃতি ছোট ছোট কারিগরি শিল্পে অনেকে নিযুক্ত ছিল। এইসব কারিগরি শিল্পীরা প্রায়ই গ্রাম ছেড়ে সেইসব জায়গায় একত্রে বাস করত, যেখান থেকে সহজেই তাদের পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করা যেত এবং বিনিময়ে তারা প্রয়োজনীয় কৃষিজাত পণ্য পেতে পারত। সাধারণতঃ

রাস্তার মোড়, নদীর তীর কিংবা মঠ বা দুর্গের পার্শ্ববর্তী স্থান তারা বেছে নিত। দস্যুদলের এবং শত্রুদের সম্ভাব্য আক্রমণ লুণ্ঠনের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য সমগ্র বসতি এলাকাটি প্রাচীর দিয়ে ঘিরে নেওয়া হত। এইসব স্থানে বণিকরাও ধীরে ধীরে এসে বসবাস শুরু করল। এইভাবে বসতিগুলো জনবহুল হয়ে ওঠে। প্রাচীর ঘেরা জায়গাটিকে বলা হত **বার্গ** আর সেখানকার অদিবাসীদের বলা হত **বার্গার** বা **বার্জেনসিস**। এই বার্গগুলোতে বণিক শ্রেণীর অভ্যুদয় ও ধীরে ধীরে বাণিজ্যের পুনর্জীবন লাভ ঘটল। বণিকরা বাইজান্টিয়াম, এশিয়া মাইনর, আরব ইত্যাদি দেশ থেকে মূল্যবান ও সহজে পরিবহণযোগ্য দ্রব্যাদি, যেমন সোনা, গন্ধদ্রব্য, রেশমী কাপড়, হাতীর দাঁত ইত্যাদি আমদানি করত এবং স্থানীয় কারুশিল্পীদের পণ্যদ্রব্য দূরবর্তীস্থানে বিক্রী করত। এইভাবে শিল্প বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে ইওরোপে নতুন নতুন শহর গড়ে উঠেছিল।

প্রথম দিকে এই শহরগুলো গ্রামের চেয়ে সামান্য বড় হত। সেখানকার অধিবাসীরা কারিগরী ও ব্যবসা-বাণিজ্য করবার সঙ্গে সঙ্গে চাষবাস করত। কিন্তু ধীরে ধীরে শহরে শিল্পের জন্য অধিকতর সময় ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন দেখা দিল। তাই প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য ও কাঁচা-মালের জন্য শহরবাসীরা প্রতিবেশী গ্রামগুলোর কৃষকদের কাছে নিজেদের তৈরী পণ্যদ্রব্য বিনিময় করত।

একাদশ শতকে নানাকারণে, বিশেষতঃ **ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের** ফলে **শহরের সংখ্যা ও প্রাধান্য বেড়ে যায়।** ধর্মযুদ্ধের ফলে পূর্বদেশে যাতায়াত খুব বেশী চলতে থাকে। ইওরোপীয়রা নতুন নতুন পণ্যদ্রব্যের ব্যবহার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে। পূর্বাঞ্চলের সমৃদ্ধ বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলোর সঙ্গে তারা পরিচিত হয়। ফলে পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে ইওরোপের ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। শহরবাসী বণিকরা ক্রমেই অর্থশালী হয়ে ওঠে এবং তাদের ক্ষমতাও খুব বেড়ে যায়। বাণিজ্যের বিরাট বিরাট কেন্দ্র হিসেবে তখন ভেনিস, জেনোয়া, পিসা, বার্সিলোনা, মার্সেই, গেট, ভিয়েনা, নভ্‌গরদ্‌, লণ্ডন, ব্রিস্টল, ডাবলিন ইত্যাদি শহর সমগ্র

ইওরোপে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই বাণিজ্যকেন্দ্র বা শহরগুলো প্রায়ই সমুদ্র বা নদীর তীরে গড়ে উঠত। কারণ প্রধানতঃ জলপথেই ব্যবসা-বাণিজ্য চলত।

সামন্ততান্ত্রিক যুগে সমাজ জীবনে সংঘবদ্ধ হওয়ার রীতি ছিল। ম্যানর বা গ্রামের অধিবাসীরা সংঘবদ্ধ জীবনযাপন করত। নতুন গড়ে ওঠা শহরগুলোতেও বণিক ও কারিগরদের গোষ্ঠী, সমিতি বা গিল্ড্ তৈরী করা হত। এক এক গিল্ডে এক এক ব্যবসার লোকেরা দলবদ্ধ হয়ে নিজ নিজ স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করত। প্রত্যেক শহরে তাঁতি, ছুতোর মুচি, কামার, মিস্ত্রী, বণিক প্রভৃতির আলাদা আলাদা গিল্ড ছিল এই যুগের বিশেষত্ব। গিল্ডগুলো জিনিষপত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করত, কাজ-কর্মের সময় ও নিয়ম স্থির করে দিত এবং সাধারণভাবে ব্যবসা পরিচালনা করত। গিল্ডের আরও এক উদ্দেশ্য ছিল, গিল্ডের সদস্যদের যাতে ক্ষতি না হয় তারজন্য অসম প্রতিযোগিতা বন্ধ করা। প্রত্যেক ব্যবসায়ে তাই কতকগুলো নিয়ম জারী করা হত—যেগুলো প্রত্যেককে মেনে চলতে হত। গিল্ডগুলো সামাজিক দায়িত্বও পালন করত। অসুস্থ এবং ক্ষতিগ্রস্ত সদস্যদের গিল্ড সাহায্য করত। বিপদে আপদে পরস্পরে সহায়তা করার ফলে প্রত্যেক গিল্ডে একটা আলাদা সমাজ-জীবন গড়ে উঠে। গিল্ডের সদস্যভুক্ত না হলে শহরে ব্যবসা-বাণিজ্য করা সম্ভব ছিল না।

প্রতি গিল্ডে থাকত ওস্তাদ কারিগর, **জার্নিম্যান** বা দিনমজুর এবং শিক্ষানবীশ। প্রথমে সকলকেই শিক্ষানবীশ করতে হত। শিক্ষানবীশির কাল শেষ হলে কারিগররা জার্নিম্যান বা দিনমজুররূপে পরিগণিত হত। পরে 'জার্নিম্যান' থেকে তারা ওস্তাদ কারিগর হতে পারত। কেবল ওস্তাদ কারিগররাই শিক্ষানবীশ রাখার বা জার্নিম্যানদের খাটাবার অধিকার পেত।

শহর-জীবনে গিল্ডগুলো গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। গিল্ডের প্রধানরাই ছিলেন শহরের প্রধান। গিল্ডের সদস্যরা শহর প্রতিরক্ষার ব্যবস্থাও করত। পরবর্তীকালে গিল্ডের মধ্যেও শোষণ দেখা দিয়েছিল।

ওস্তাদ কারিগররা সহকারীদের পরিশ্রমের ফল আত্মসাৎ করত। নিজেদের স্বার্থ কায়েম রাখার জন্য বহু যোগ্য দিনমজুরকেও ওস্তাদরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হত না এবং অনেকক্ষেত্রে নতুন যন্ত্রপাতি আবিষ্কার ছিল নিষিদ্ধ।

তখনকার দিনের শহরগুলো আজকালকার শহরের মত জনবহুল ছিল না। শহরগুলো ছিল প্রাচীরঘেরা। জনসংখ্যা পাঁচ-ছয় হাজারের বেশী হত না। জনজীবন ছিল কর্মব্যস্ত। ব্যবসা ও কারিগরী শহরের প্রধান অর্থনৈতিক ভিত্তি হলেও কিছু কিছু চাষবাসও হত। নোংরা সরু সরু আঁকা-বাঁকা গলিতে ভরা, অন্ধকার—এই ছিল শহরগুলোর সাধারণ চেহারা। জমির পরিমাণ সীমিত থাকায় দু-তিন তলা বাড়ী তৈরী হত। সাধারণতঃ কুয়ো থেকে জল সরবরাহ করা হত। আবর্জনা ও ময়লা জল নিকাশের সুবন্দোবস্ত ছিল না। ফলে প্রায়ই বাড়ীর জানালা থেকে ফেলা আবর্জনা পথচারীদের মাথার ওপর এসে পড়ত। শহরে স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা ছিল খুব খারাপ। ফলে মাঝে মাঝে সংক্রামক ব্যাধি মহামারীর আকার ধারণ করত। একদিকে যেমন বাজার হাট, মেলা, দোকান প্রভৃতিতে শহর সরগরম থাকত, তেমনি চোর-ডাকাতের উপদ্রবও ছিল খুব। চৌকিদার চৌকি দিয়ে ফিরত।

বাজার এলাকা ছিল শহরের একমাত্র খোলা জায়গা। বাজারের কাছেই থাকত উপাসনালয় এবং টাউন-হল। টাউন-হলে শহর পরিচালনার জন্য গঠিত নগর পরিষদের কাজকর্ম পরিচালনা করা হত।

শহরের অধিবাসীরা কখনো প্রত্যক্ষ যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমে, কখনো নগদ অর্থের বিনিময়ে সামন্ত প্রভুদের (যাদের এলাকায় শহর গড়ে উঠত) কাছ থেকে বহুবিধ অধিকার আদায় করেছিল। এইভাবে শহরগুলো নিজস্ব নাগরিক পরিষদ গঠন করার অধিকার এবং সামন্ত-তান্ত্রিক কর, বেগার শ্রম ও বাধ্যতামূলক সামরিক কর্তব্যপালন থেকে রেহাই পায়। শহরগুলোতে তাই সামন্ত প্রভুদের আধিপত্য ছিল না। এমন কি ভূমিদাসরাও ভূমিদাসত্ব থেকে মুক্তি পাবার জন্যে একটি নির্দিষ্ট

সময়ের জন্য শহরে লুকিয়ে থাকত। এইভাবেই সে যুগে প্রবাদের সৃষ্টি হয়—"শহরের বাতাস মানুষকে স্বাধীন করে।"

সমগ্র ইওরোপে শহরাঞ্চলের দ্রুত বিকাশের ফলে রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন দেখা দেয়। শহরগুলোর বণিক ও কারুশিল্পীরা বাণিজ্য বিস্তারে বেশী উৎসাহী ছিল। সামন্ত প্রভুরা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকতেন এবং মাঝে মাঝেই বণিকদের লুণ্ঠনের চেষ্টা করতেন। শহরের বণিকরা তাই সামন্ত-প্রভুদের অত্যাচার প্রতিরোধের জন্য শক্তিশালী রাজশক্তির পক্ষপাতী ছিল। সামন্ত প্রভুদের অত্যাচার নিবারণের জন্য তাই দেশের রাজাকে তারা অর্থ ও সশস্ত্র সৈন্য দিয়ে সাহায্য করত। বিনিময়ে রাজারাও রাজকীয় সনদের দ্বারা শহরগুলোর স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এইভাবে ইওরোপে রাজা ও তাঁদের শহরের প্রজাদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হল। রাজারা রাজপরিষদে শহরগুলোর প্রতিনিধিদেরও আহ্বান করতেন। এইভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে অভিজাত শ্রেণী ও যাজক শ্রেণীর মতই সমান গুরুত্ব অপর একটি শ্রেণীর উদ্ভব হল। এই শ্রেণী ছিল প্রধানতঃ বণিক ও মহাজনদের নিয়ে গঠিত। এদের বলা হত **বুর্জোয়া শ্রেণী**।

অনুশীলনী

১। মধ্যযুগে ইওরোপে কিভাবে শহরের উদ্ভব ঘটে?

২। গিল্ড কাকে বলে? কিভাবে গিল্ড গঠিত হয়? শহর জীবনে গিল্ড কি ভূমিকা পালন করত?

৩। মধ্যযুগের শহর জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৪। ইওরোপে শহরের বিকাশের ফলে রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে কি কি পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল?

দশম অধ্যায়

॥ মধ্যযুগে দূর প্রাচ্যের ইতিহাস ॥

(The Far East in the Middle Ages)

প্রথম পরিচ্ছেদ

মধ্যযুগে চীনদেশ [China in Medieval Period (from early 7th century to 14th century)] :

(ক) **তাং যুগ** (৬১৮ খ্রীস্টাব্দ—৯০৭ খ্রীস্টাব্দ) : পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যজাতিগুলোর মধ্যে চীন অন্যতম। সপ্তম শতাব্দীর সূচনায় চীনদেশে তাং রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই তাং বংশের রাজত্বকালকেই **চীন ইতিহাসের সুবর্ণযুগ** বলা হয়। ৬১৮ খ্রীস্টাব্দে কাওৎসু এই বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় দশ বছর রাজত্ব করার পর তিনি রাজ্যভার তুলে দেন পুত্র **তাই সুং**-এর হাতে। তাই সুং-এর বয়স তখন একুশ বছর। তিনি ছিলেন মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক এবং প্রাচীন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি।

পূর্বতন রাজবংশগুলোর আমলে তাতারদের আক্রমণে চীনদেশ ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। দেশে দেখা দিয়েছিল চরম বিশৃঙ্খলা। তাই সুং প্রবল পরাক্রমে তাতার আক্রমণকারীদের হটিয়ে দিয়ে **খণ্ডিত চীনকে আবার ঐক্যবদ্ধ করেন**। তিনি এক বিরাট ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল পশ্চিম পারস্য ও ক্যাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত, উত্তরে গোবি মরুভূমি পেরিয়ে কিরঘিজ স্তেপ ও আলতাই পর্বতমালা পর্যন্ত, পূর্বে আসাম ও দক্ষিণে তিব্বত পর্যন্ত। তাঁর রাজধানী ছিল **চ্যাং আন** শহরে তাঁর পুত্র কোরিয়া দেশকেও তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করেছিলেন।

তাং বংশের পূর্ববর্তী সুই রাজবংশের আমলে আইন ও দণ্ডব্যবস্থা ছিল অযৌক্তিক ও অতিমাত্রায় কঠোর। তাং সম্রাটগণ এই **আইন ব্যবস্থার সংস্কার** করেন। কঠোর শাস্তিদান প্রথা রদ করে, লঘু দণ্ড চালু করা হয়। বিনা বেতনে বেগার খাটা কমানো হয়। খাজনা

ও কর আদায় ব্যবস্থা পুনর্বিন্যস্ত করা হয়। পরিত্যক্ত ও পতিত জমিগুলো বণিক, হস্তশিল্পী ও সরকারী দাসদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। ফলে কৃষিকার্যের প্রভূত উন্নতি ঘটে এবং বাণিজ্য ও হস্তশিল্পের বিস্তার ঘটে। তাং যুগের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সাংস্কৃতিক অগ্রগতির সূচনা করেছিল। এই সংস্কার নীতিগুলো কার্যকর করার জন্য সূক্ষ্মভাবে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত একটি প্রশাসন যন্ত্র গঠন করা হয়। একদল সদাজাগ্রত পরিদর্শক প্রশাসনের কাজে তদারক করত। এই পরিদর্শকদের কাজে সাহায্য করত একটি সেনাবাহিনী। তাং বংশের সম্রাটরা এইভাবে সামন্ততান্ত্রিক আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিটি প্রায় ত্রুটিহীন করে তোলেন। ৬৫৩ খ্রীস্টাব্দে **তাং আইনবিধি** প্রকাশিত হয়। ৭৩৭ খ্রীস্টাব্দে এই আইনবিধি সংশোধন করা হয়। আনাম ও জাপানের আইন ব্যবস্থাকে এই আইনবিধি গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

সম্রাট তাই-সুং এর মন্ত্রিরা দেশে চুরি, ডাকাতি ও অন্যান্য অপরাধ বন্ধ করবার জন্য, তাঁকে কঠিন আইন প্রবর্তন করতে অনুরোধ করেন। তখন তিনি বলেন, "আমি যদি সৎ রাজ-কর্মচারী নিযুক্ত করি, যদি করভার লাঘব করি ও ব্যয় কমাতে পারি, তাহলে দেশের লোক ভালভাবে খেতে-পরতে পাবে ; আর দেশের লোক সুখে থাকলে চুরি-ডাকাতি বন্ধ হয়ে যাবে, কঠিন আইনের প্রয়োজন হবে না।" একবার তিনি জেলখানা পরিদর্শন করতে গিয়ে ২৯০ জন মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত অপরাধীকে দেখেন। ফিরে আসবার প্রতিশ্রুতিতে তিনি তাদের চাষ করতে পাঠান। কাজ শেষ করে তারা ফিরে এলে তিনি তাদের সকলকে মুক্তি দেন। তিনি নিয়ম করেন যে, **অন্তত তিনদিন উপবাস না করে কোন সম্রাট** মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দিতে পারবেন না।

তাংসাম্রাজ্য ছিল পনেরোটি প্রদেশে বিভক্ত। কেন্দ্রীয় সরকার প্রথমে ছিল খুবই শক্তিশালী। কিন্তু বিভিন্ন যুদ্ধবিগ্রহের ফলে ক্রমে কেন্দ্রীয় শাসন দুর্বল হয়ে পড়ে। ছোট ও মাঝারি ধরনের ভূস্বামীদের সংখ্যা বেড়ে যায়। তাদের অধীনস্থ কৃষকশ্রেণী ধীরে ধীরে ভূমিদাসে পরিণত হয়। জমির মালিকানা ভূস্বামীদের হাতে চলে যাওয়ায় সরকারী

রাজস্বের পরিমাণ কমে যায়। সামন্ত প্রভুদের অত্যাচারের ফলে নবম শতাব্দীর শেষভাগে চীনে কৃষকরা কয়েকটি বিদ্রোহ করে।
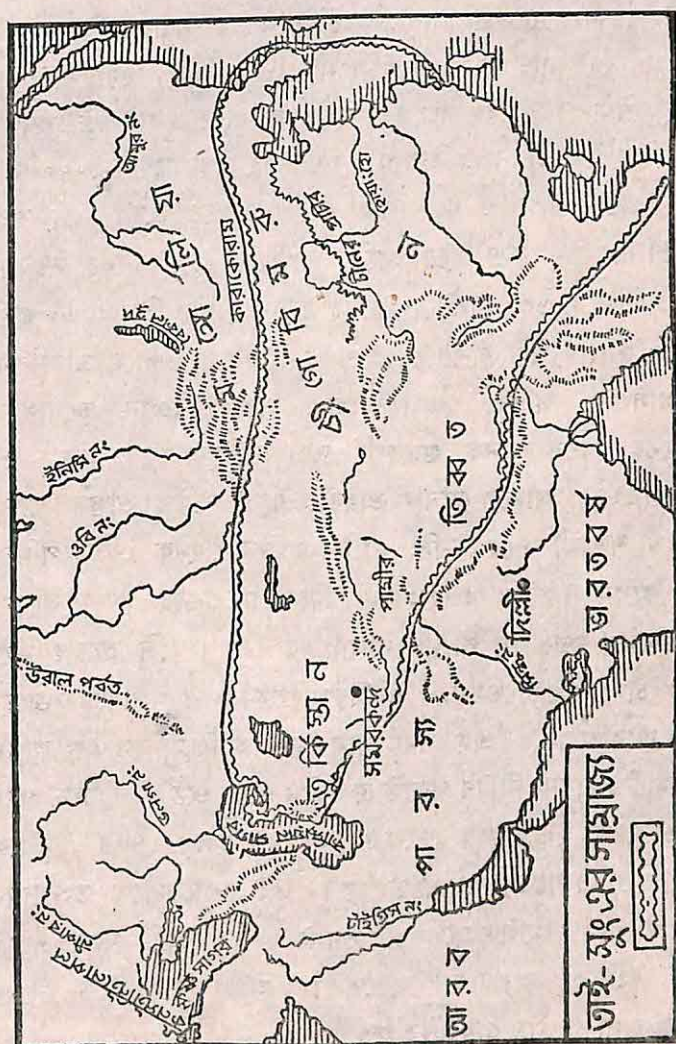
সরকারীভাবে কনফুশীয় ধর্মের পৃষ্ঠপোষণা করা হলেও ধর্ম বিষয়ে তাং সম্রাটরা মোটামুটিভাবে উদার ছিলেন। বিভিন্ন ধর্মের লোকেরা স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণ করতে পারত। ইওরোপ কিন্তু এই সময় ধর্মবিরোধে ডুবে ছিল।

তাং যুগে চীনের সংস্কৃতি পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের জন্য চীনদেশ চিরকালই বিখ্যাত। সম্রাট তাই সুং এর আমলে সরকারী চাকরী পাবার জন্য নানাবিধ পরীক্ষা দিতে হত। বিভিন্ন বিষয়ে পাণ্ডিত্য না থাকলে সরকারী চাকুরী পাওয়া যেত না। কাজেই শিক্ষা বিস্তারের জন্য তাই সুং রাজধানীতে একটি বড় গ্রন্থাগার ও বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। এই গ্রন্থাগারে ৯০,০০০ গ্রন্থ ছিল। প্রদেশগুলিতেও বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। বহু শহর গুরুত্বপূর্ণ সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়ে ওঠে। রাজধানী চাং আনের সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, ৬৩১ খ্রীস্টাব্দে চৈনিক ছাত্রের সংখ্যা ছিল ৩২৬০ জন। কোরিয়া, জাপান, মধ্য এশিয়া থেকেও বহু সহস্র ছাত্র এখানে জ্ঞানার্জনের জন্য আসত। গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, ভূগোল ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আবিষ্কৃত হয়। প্রথম তাং সম্রাট কাওৎসুর আমলে জনৈক ভারতীয় একটি পঞ্জিকা প্রস্তুত করেন। এর এক শতাব্দী পরে ই-সিং নামে একজন চৈনিক একটি পঞ্জিকা প্রস্তুত করেন। তিনি ৩৬৫·২৪৪৪ দিনে সৌরবর্ষের গণনা করেন। তিনি ছিলেন ভারতীয় পণ্ডিত বজ্রবোধির শিষ্য। **লি ইয়েন** নামে একজন চীনা পণ্ডিত ভেষজ ও ওষধিবৃক্ষ সংক্রান্ত একটি সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করেছিলেন। এই সময় চীনে বারুদ আবিষ্কৃত হয় এবং কাগজ ও চীনামাটির বাসন নির্মাণ পদ্ধতি ত্রুটিহীন হয়ে ওঠে। বিজ্ঞান চর্চায় তখন চীনদেশ ইওরোপের থেকেও অগ্রসর ছিল। ৭৫৪ খ্রীস্টাব্দে চীনে **সাহিত্য একাডেমী** প্রতিষ্ঠিত হয়। এই একাডেমীতে তৎকালীন বিখ্যাত পণ্ডিতরা মিলিত হতেন। সম্রাট চুং সুং প্রতি বছর একটি সাহিত্য উৎসবের আয়োজন করতেন। অষ্টম শতাব্দীতে চীনের রাজধানীতে সংবাদ পত্র প্রকাশিত হত।

তাং বংশের রাজত্বকাল মহান কাব্য সৃষ্টির যুগ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। একজন চীনদেশীয় পণ্ডিত একবার বলেছিলেন যে, তাং বংশের আমলে চীন দেশের সব মানুষই ছিল কবি। এই যুগে চীন কাব্য ও সৌন্দর্যের পূজারী হয়ে ওঠে। এ যুগের কবিদের

মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন **লি পো, টুকু, পো-চু-ই** প্রভৃতি। এই কবিরা কেউ ছিলেন উচ্চ রাজকর্মচারী, কেউ সৈনিক, কেউ বা সন্ন্যাসী। সহজ, সরল ভাষায় এরা দৈনন্দিন জীবন ও প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে কবিতা লিখেছিলেন। এই যুগের **চুয়ান চিই** বা অলৌকিক কাহিনী সাহিত্যের ক্ষেত্রে নতুন ইতিহাসের সৃষ্টি করে। এটাই ছিল উপন্যাস লেখার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা। এই সব রচনায় বাস্তব পৃথিবী সম্পর্কে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সন্ধান পাওয়া যায়। এই যুগে দুটি "জ্ঞান কোষ" গ্রন্থও রচিত হয়েছিল। সরকারী নীতি থেকে শুরু করে কারুশিল্প, ভেষজ ইত্যাদি সকল বিষয়ই এই গ্রন্থদ্বয়ে আলোচিত হয়েছে। এ যুগের দুজন বিখ্যাত লেখক ছিলেন তু য়ু এবং হান য়ু। এ যুগের ছোট গল্প লেখকদের মধ্যে চাং সু-র নাম উল্লেখযোগ্য। সপ্তম থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যে নাট্য সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রেও উন্নতি ঘটে।

তাং যুগে জনপ্রিয় পানীয়রূপে **চায়ের প্রচলন** বৃদ্ধি পায়। চীনের সম্রাটরা অমরত্ব প্রদানকারী আরক আবিষ্কারে উৎসাহী ছিলেন। এইভাবে পার্বত্য অঞ্চলে ওষধি বৃক্ষের খোঁজ করতে গিয়ে চা-গাছ আবিষ্কৃত হয়। চীনের লোকেরা নিজেদের কুটির সংলগ্ন প্রাঙ্গণেই প্রয়োজনীয় চা উৎপাদন করত। কোন বড় বাগিচায় চায়ের চাষ হত না। তাং যুগে রচিত 'চা শাস্ত্রে' উঁচু মানের চায়ের কি কি গুণ থাকা উচিত তা সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। চায়ের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাওয়ায় ৭৮০ এবং ৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে চায়ের উপর সম্রাটরা কর ধার্য করেছিলেন। চা পান প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পানপাত্ররূপে চীনামাটির পাত্রের চাহিদা বেড়ে যায়। ফলে চীনামাটির পাত্র তৈরীর শিল্প অভূতপূর্ব উন্নতি লাভ করে। চা-শাস্ত্রে, চা পানের জন্য উপযুক্ত পাত্রের ব্যবহারের কথাও উল্লেখ আছে।

তাং যুগেই সূচনা হয়েছিল **কাঠের ব্লকের সাহায্যে ছাপার কাজের**। এ যুগের সাংস্কৃতিক অগ্রগতি, সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু নতুন নতুন রচনা এবং সরকারী চাকরী ক্ষেত্রে পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু করার জন্য একসঙ্গে বহু পাঠ্য বইয়ের প্রয়োজনীয়তা, ছাপার কৌশল

আবিষ্কারে প্রেরণা দিয়েছিল। সপ্তম শতাব্দী থেকে চীনের ছাপার কাজের সূচনা হয়েছিল বলে জানা যায়। পৃথিবীর প্রাচীনতম ছাপানো
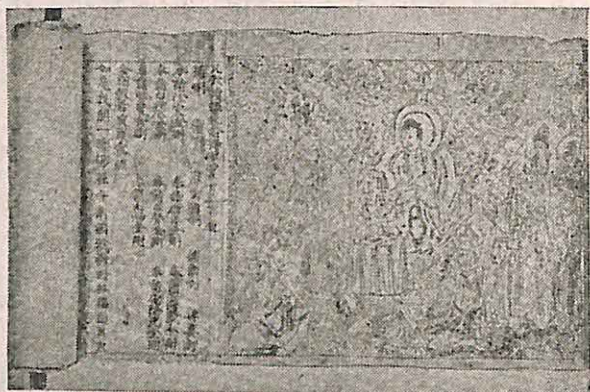
প্রাচীনতম ছাপানো গ্রন্থের নিদর্শন : হীরক সূত্র

বই হল চীনের **"হীরক সূত্র"** গ্রন্থটি। এটি ছাপানো হয়েছিল ৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে।

এই যুগে চীনের **কারুশিল্পের** বিশেষ উন্নতি হয়। চিত্র শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন য়ু-তাও-ন, লি-শু-হুন, ওয়াং ওয়েই প্রভৃতি। এদের আঁকা ছবিগুলো পৃথিবীর শিল্প ভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ। বুদ্ধদেবের জীবনী অবলম্বনে প্রাচীর চিত্র অঙ্কনের প্রচলনও হয়েছিল। স্থাপত্য ও ভাস্কর্যেও চীনের অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। সপ্তম শতাব্দীর সূচনায় নির্মিত দক্ষিণ হোপেই-এ একটি পাথরের সেতু আজও টিঁকে রয়েছে। ভারতে গুপ্তযুগের মত চীনে তাং বংশের রাজত্বকালও শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে স্বুবর্ণ যুগের সূচনা করেছিল।

তাং-যুগে **কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যেরও উন্নতি** ঘটেছিল। প্রাচীন কাল থেকেই চীনের কৃষকরা বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত ছিল। তাং যুগে বহু সেচ, খাল ও বাঁধ নির্মিত হয়েছিল। পূর্ববর্তী রাজত্বকালে নির্মিত ১৭০০ কিলোমিটার লম্বা 'প্রধান খাল'টি সেচ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য খুবই কার্যকরী ছিল। এ যুগের প্রধান ফসল ছিল ধান। দক্ষিণ চীনে বছরে দুবার ধান উৎপন্ন হত। চা, মশলা ও

ইক্ষুর চাষও প্রচলিত ছিল। ফলের মধ্যে কমলালেবুর চাষ ছিল বেশী। চীনের বাড়তি চাল, রেশম ও মশলা বিদেশে চালান যেত। জলপথে চীনা বণিকরা আনাম, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, ভারত ইত্যাদি অঞ্চলে ব্যবসা বাণিজ্য করত। দক্ষিণ চীনে আরব বণিকদের স্থায়ী বাণিজ্যকুঠি ছিল। স্থলপথে মধ্য-এশিয়া, পারস্য, বাইজান্টিয়াম ইত্যাদি দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। বৈদেশিক বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান উপকরণ ছিল চিত্রিত মৃৎপাত্র ও চীনামাটির বাসন। আরব বণিক সুলেমান নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে লিখিত বিবরণীতে চীনামাটির বাসনের স্বচ্ছতা ও সূক্ষ্মতার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

চীনদেশে বৌদ্ধধর্মমত ঃ প্রাচীন যুগ থেকে চীনে কনফুশীয় ধর্মমত বহুল প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই মতবাদ চীনাবাসীর অধ্যাত্ম-তৃষ্ণাকে মেটাতে পারেনি। এই প্রয়োজন মেটায় বৌদ্ধ ধর্মমত। কবে এবং কিভাবে চীনে বৌদ্ধ ধর্মমত প্রচারিত হয় সে বিষয়ে নানা কাহিনী কিংবদন্তী আছে। ভারতবর্ষ থেকে মধ্য-এশিয়ার পথেই বৌদ্ধ ধর্ম চীনে প্রবেশ করেছিল। খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করতে শুরু করে। কয়েকজন চীন সম্রাটও বৌদ্ধ-ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ধীরে ধীরে বৌদ্ধ ভাবধারা চীনের জাতীয় জীবনে ছড়িয়ে
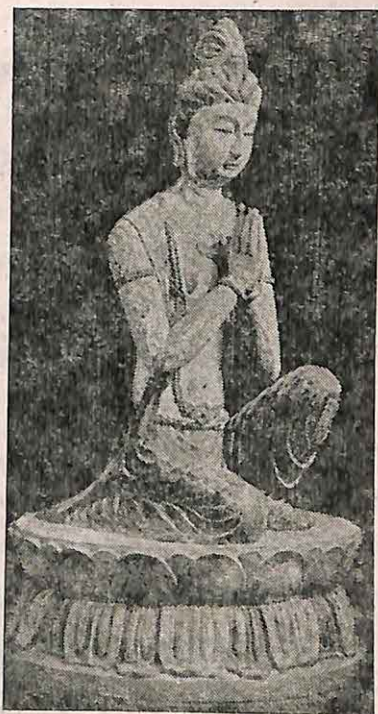
অষ্টম শতাব্দীর বোধিসত্ত্ব মূর্তি

পড়ে। মাঝে মাঝে অবশ্য কনফুশীয় ও তাও মতাবলম্বী সম্রাটগণ বৌদ্ধদের ওপর নানা অত্যাচার করতেন।

তিন শতাব্দীব্যাপী তাং রাজত্বকালে চীনে এক অভূতপূর্ব সৃজনশীল ও বুদ্ধিদীপ্ত যুগের সূচনা হয়। এ যুগে চীনে বৌদ্ধধর্মমত সর্বাধিক পরিব্যাপ্তি লাভ করে। সম্রাট তাই-সুং-এর রাজত্বকালে চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ ভারতে আসেন এবং ভারত থেকে বুদ্ধের বাণী বহন করে নিয়ে যান। এ যুগে চীনদেশে অসংখ্য সংস্কৃত বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করা হয়। চীনদেশের মানসিকতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বৌদ্ধ ধর্মমতের কিছু কিছু পরিবর্তন করা হয়েছিল। বৌদ্ধ ধর্মমত বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে স্থাপত্য ও চিত্রশিল্পের প্রভূত উন্নতি ঘটে। এ যুগের স্থাপত্য ও চিত্রশিল্পের কিছু কিছু নিদর্শন এখন-ও কালজয়ী হয়ে টিকে রয়েছে।

চীনের সভ্যতা, শিল্প-সংস্কৃতি এবং বৌদ্ধধর্মমত চীনদেশ থেকে পার্শ্ববর্তী দেশগুলো, যেমন, জাপান, কোরিয়া, আনাম ইত্যাদি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। জাপান ছিল চীনের প্রতিবেশী দেশ। আনাম ও কোরিয়া সম্রাট তাই-সুং সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ভৌগোলিক নৈকট্য এবং নৃতত্ত্বগত সাদৃশ্যের ফলে এই অঞ্চলগুলোর ওপর চীনের প্রভাব ছিল অপরিসীম। বাণিজ্যিক যোগাযোগ এই সম্পর্ককে সুদৃঢ় করেছিল। কোরিয়া, জাপান ও আনাম থেকে ছাত্ররা চীনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যার্জনের জন্য আসত। চীনা পণ্ডিতরাও ঐ সব দেশে গিয়ে বসবাস ও শিক্ষাদান করতেন। চীনের শিল্প ও স্থাপত্যরীতির অনুকরণে জাপান, কোরিয়া ইত্যাদি অঞ্চলের প্রাসাদ, সেতু, শিল্পবস্তু ইত্যাদি নির্মিত হয়। এইভাবে চীনদেশ থেকে সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলো পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছিল।

হিউয়েন সাঙ্-এর ভারত ভ্রমণ ও তাঁর প্রভাব ঃ তাং সম্রাট তাই সুং-এর রাজত্বকালে চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন (৬২৯ খ্রীঃ)। বিদেশ যাত্রার অনুমতি না পাওয়ায় তিনি গোপনে চীন থেকে যাত্রা করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২৯

বছর। গোবি মরুভূমি অতিক্রম করে বহু বাধা বিপত্তি পেরিয়ে মধ্য এশিয়া পার হয়ে পামীরের পথে তিনি ভারতে প্রবেশ করেন। দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে তিনি ভারতে বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন ও বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। দীর্ঘ ১৬ বছর পর তিনি ৬৪৫ খ্রীস্টাব্দে চীন দেশে ফিরে যান। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন ২০টি ঘোড়ার পিঠে শত শত সংস্কৃত পুঁথি, পাণ্ডুলিপি, কাঠ ও পাথরের তৈরী বুদ্ধের মূর্তি এবং বহু মূল্যবান জিনিষপত্র। চীনের রাজধানীতে তাঁকে রাজকীয় সম্বর্ধনা জানানো হয়। রাজপথগুলো সাজানো হয়, সকলের ছুটি ঘোষণা করা হয় এবং চীনবাসী আনন্দে মুখর হয়ে ওঠে। তাঁর দুঃসাহসী অভিযানকে কেন্দ্র করে বহু লোকগাথা ও কাহিনী কিংবদন্তীর সৃষ্টি হয়। দেশে ফেরার পর হিউয়েন সাঙ্ বৌদ্ধশাস্ত্র সংক্রান্ত সংস্কৃত পুঁথিগুলো চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন।

(খ) **সুং যুগ** (৯৬০-১২৮০ খ্রীস্টাব্দ): তাং বংশের পতনের পর চীনে অর্ধ শতাব্দীকাল ধরে রাজনৈতিক গোলযোগ ও অস্থিরতা চলে। অবশেষে ৯৬০ খ্রীস্টাব্দে চাঙ-কুয়াঙ-ইন নামে চীনের জনৈক সেনানায়ক নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন এবং সুং বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। তাং বংশের তুলনায় সুং বংশ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রাজ্যে রাজত্ব করেছিল। **চীনের ইতিহাসে সুং যুগ অর্থনৈতিক অগ্রগতি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার এবং শিল্প ও শিক্ষা প্রসারের জন্য স্মরণীয় হয়ে আছে।** সুং আমলে প্রথমে রাজধানী ছিল কাই ফেং শহরে, পরে হাংচাও-এ রাজধানী স্থানান্তরিত হয়েছিল।

সুং আমলে আভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার সাধন করা হয়েছিল। এদের মধ্যে অন্যতম হল **ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ** ব্যবস্থা। এযুগে ভারতবর্ষ, আরব, পারস্য ইত্যাদি দেশের সঙ্গে চীনের সামুদ্রিক বাণিজ্যের পরিমাণ খুবই বেড়ে যায়। এযুগের একটি বিবরণী থেকে জানা যায়, সোনা, রূপো, তামা, সীসে, রঙ্গীন দ্রব্যাদি চীনামাটির বাসন ইত্যাদির বিনিময়ে চীনা বণিকগণ ধুনো, ওষুধ, হাতির দাঁত, মূল্যবান পাথর, সুতীবস্ত্র ইত্যাদি

আমদানি করত। এই বাণিজ্য ছিল খুবই লাভজনক। ৯৭৯ খ্রীস্টাব্দ থেকে এই লাভজনক বাণিজ্যের ওপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং চীন সরকার লাভের অংশ গ্রহণ করতে থাকেন। সুং সম্রাটদের উদ্দেশ্য ছিল গুরুত্বপূর্ণ ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন ও বিক্রয় ব্যবস্থা সরকারের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণে রাখা। মাঝে মাঝে জলদস্যুদের অত্যাচার সত্ত্বেও, দশম শতাব্দীর শেষভাগে অর্ধলক্ষ মুদ্রা থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সরকারী লাভের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ৬৫ লক্ষ মুদ্রা। এই আয়ের অধিকাংশই ব্যয় করতে হত উত্তর চীনের যাযাবর জাতিগুলোর আক্রমণ থেকে সাম্রাজ্য প্রতিরক্ষার জন্য।

একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সুং আমলের একজন প্রধানমন্ত্রী ওয়াং আন-শি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রচলন করেছিলেন। তাঁর সংস্কারগুলোকে আধুনিক পরিভাষায় সমাজতান্ত্রিক সংস্কার বলা যেতে পারে। চীনের কৃষকগণ মহাজন দ্বারা শোষিত হত। তাই তিনি বসন্তকালে শস্যচারা পল্লবিত হওয়ার সময়ে কৃষকদের জন্য কৃষি ঋণের ব্যবস্থা করেন। ফসল কাটার পর কৃষকদের এই ঋণ পরিশোধ করতে হত। এইভাবে একদিকে যেমন কৃষকগণ মহাজনদের কবল থেকে মুক্ত হয়ে বেশী পরিমাণ জমি ভালভাবে চাষ করতে পারত এবং বেশী পরিমাণ ফসল লাভ করত, অপরদিকে রাষ্ট্রও লাভবান হত।

ওয়াং আন-শি বাধ্যতামূলক সরকারী কর্তব্য সম্পাদনের পরিবর্তে আনুপাতিক হারে সম্পদকর ধার্য করেছিলেন। বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় ও ধর্মীয় মঠগুলো, সরকারী কর্মচারী, মহিলাগণ, যারা বাধ্যতামূলক কর্তব্যের আওতার বাইরে ছিলেন, তাঁদের সকলকেই সম্পদকর দিতে হত। সংগৃহীত অর্থ জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হত। ওয়াং আন-শি আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ শাসন সংস্কার প্রচলন করেছিলেন। তাঁর কর নীতি ও সংস্কার নীতি পরবর্তীযুগে চীনদেশের সকল সংস্কার ব্যবস্থার আদর্শ স্থানীয় বলে বিবেচিত হত।

সুং আমলের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সাংস্কৃতিক উন্নতির পথ সুগম করেছিল। ওয়াং আন-শি শিক্ষার প্রসারে উৎসাহী ছিলেন। প্রতিটি

অঞ্চলে তিনি সরকারী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সমসাময়িক ও প্রাচীন গ্রন্থাদি বেশী পরিমাণে ছাপানো হতে থাকে। কনফুশীয়, বৌদ্ধ ও তাও বাদী পণ্ডিতরা ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিক্ষা দিতেন। বহু গ্রন্থাগার এই সময় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিখ্যাত ঐতিহাসিক সুমা কুয়াঙ এ যুগেই তার বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। মধ্য-যুগের ইউরোপের ত্রুবেদরদের মতো এযুগে চীনদেশে একদল পেশাদার গল্পকথক ছিলেন। চীনা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে এদের যথেষ্ট অবদান ছিল। এ যুগে কাব্য, স্থাপত্য, উদ্যানবিদ্যা, এবং ভ্রমণকাহিনী নিয়ে প্রচুর গ্রন্থাদি রচিত হয়। এযুগের চিত্রশিল্প খুবই উন্নতি লাভ করেছিল এব চিত্র-শিল্পের জন্য একটি রাজকীয় একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়। চীনা মাটির বাসন নির্মাণ পদ্ধতি, বিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র ও ভেষজশাস্ত্র চর্চার জন্য সুং-যুগ বিখ্যাত ছিল। বসন্ত রোগের টীকা দেবার পদ্ধতি এ যুগেই আবিষ্কৃত হয়েছিল।

সুং যুগের চিত্র

ইউয়ান যুগ (১২৮০-১৩৬৮ খ্রীস্টাব্দ): ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষদিকে চীনে ইউয়ান রাজবংশ নামে একটি **মোঙ্গল রাজবংশ** প্রতিষ্ঠিত হয়। মোঙ্গলরা ছিল উত্তর-পূর্ব এশিয়ার এক যাযাবর জাতি। ঘোড়ায় চড়ে দলবেঁধে তারা ঘুরে বেড়াত। তাঁবুতে থাকত এবং খেত মাংস, ঘোড়ার দুধ বা সেই দুধের তৈরী অন্য খাবার। পশুপালন, শিকার আর যুদ্ধ করেই তারা জীবন কাটাত। ঘোড়ার পিঠ থেকে তীর ছুঁড়ে যেমন তারা লক্ষ্যভেদ করতে পারত, তেমনি দক্ষ ছিল তারা তলোয়ার ও ছোরা চালাতে। সম্ভবতঃ তারা বারুদের ব্যবহারও শিখেছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিখ্যাত মোঙ্গোল নেতা চেঙ্গিস-খানের অধীনে তারা একটি দুর্ধর্ষ সামরিক জাতিতে পরিণত হয়।

পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা গেছে সভ্যতার বিচারে পশ্চাৎপদ জাতিগুলো সুসভ্য জাতিগুলোকে প্রায়ই পরাজিত করেছে। সভ্যতার বিচারে যারা শক্তি, সাহস ও উদ্দীপনায় হীন, তারা যে সর্বদা হীন হবে, তা নয়। বহু দিনের সভ্যতা ও সমৃদ্ধি যে অবসাদ আনে তা থেকে অপেক্ষাকৃত বর্বর জাতিগুলো মুক্ত থাকে। এইভাবে দেখা যায় সুসভ্য রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়েছিল বর্বর জার্মান উপজাতিদের আক্রমণে, তুর্কীদের আক্রমণে ধ্বংস হয়েছিল কন্‌স্ট্যান্টিনোপল আর মোঙ্গোলদের আক্রমণে ধ্বংস হয়েছিল খলিফার সাম্রাজ্য ও চীনের সাম্রাজ্য।

চেঙ্গিস খান পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর থেকে পশ্চিমে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর এই সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন তাঁর পুত্র ওগদাই খান। তিনি পূর্ব ইওরোপের বিভিন্ন অঞ্চল জয় করে ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর মঙ্গু খান মোঙ্গোলদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর এক ভাই **কুবলাই খানকে** চীনের প্রধান শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ক্রমে সমগ্র চীনদেশ মোঙ্গোলদের অধিকারে আসে। মঙ্গু খান তিব্বত, পারস্য ও সিরিয়া দেশে আক্রমণ চালান। মঙ্গু খানের আরেক ভাই হুলাগু খলিফার রাজধানী বাগদাদ শহরটি ধ্বংস করে দেন।

কুবলাই খান

মঙ্গু খানের মৃত্যুর পর কুবলাই মোঙ্গোলদের প্রধানরূপে নির্বাচিত হন। তিনি মোঙ্গোলদের তৎকালীন রাজধানী কারাকোরাম ত্যাগ করে চীনের পিকিং শহরে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। এই সময় থেকে মোঙ্গল সাম্রাজ্য মোটামুটি দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়—পূর্বে কুবলাই খান আর পশ্চিমে হুলাগু রাজত্ব করতে থাকেন। কুবলাই খান চীনদেশকেই তাঁর সাম্রাজ্যের কেন্দ্ররূপে গড়ে তোলেন। এইভাবে চীনদেশে

ইউয়ান রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই রাজবংশ ১৩৬৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত টিকে ছিল।

কুবলাই খান সমগ্র চীনদেশ, ইন্দোচীন, কোরিয়া ও ব্রহ্মদেশ জয় করেছিলেন। তার রাজসভা জাঁকজমক ও মনীষী সমাগমে তৎকালীন এশিয়ার শ্রেষ্ঠ রাজসভারূপে পরিগণিত হয়।

মোঙ্গল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ফলে এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কারাকোরাম ও পিকিংয়ে বহুদেশের জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরা সমবেত হতেন। পোপের দূত, ভারতীয় ও পারসিক বৈজ্ঞানিক, আরব রাজপুরুষ, ইটালি ও ফ্রান্সের কারিগর, ভারতীয় বৌদ্ধ শ্রমণ, বাইজান্টাইন ও আর্মেনীয় ব্যবসায়ী সকলেই জড় হতেন সেখানে। কাজেই মোঙ্গোলদের নিছক বর্বর বলা যায় না। সমর বিদ্যায় তারা ছিল অত্যন্ত কুশলী। আক্রমণ করার আগে তারা গুপ্তচর মারফৎ সংবাদ সংগ্রহ করত।

মোঙ্গলগণ তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম বা লামাবাদে বিশ্বাসী ছিল। ইউয়ান সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষণায় লামাবাদ চীনদেশে প্রসার লাভ করে। চীনের রাজধানী ও অন্যান্য বহুস্থানে লামা মঠ প্রতিষ্ঠিত হত। কুবলাই খানের রাজত্বকালে প্রতি বছর বৌদ্ধ ধর্মোৎসব অনুষ্ঠিত হত। চীনদেশীয় বৌদ্ধরা মোঙ্গল সম্রাটদের অনুগ্রহ লাভ করলেও কনফুসীয় এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ওপর ধর্মীয় অত্যাচার হত।

মর্কো পোলোর ভ্রমণ কাহিনী ঃ সম্রাট কুবলাই খান ও তাঁর সাম্রাজ্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণা খুবই অস্পষ্ট থাকত, যদি ইতালিয় পরিব্রাজক মার্কো পোলোর ভ্রমণ কাহিনীটি না পাওয়া যেত। মার্কো পোলো দীর্ঘ দিন কুবলাই খানের সাম্রাজ্যে বাস করেন। তাঁর ভ্রমণ কাহিনীটি পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। একবার ইতালির ভেনিস ও জেনোয়া শহরের মধ্যে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ভেনিসের সৈন্যরা হেরে যায়। পরাজিত বন্দীদের মধ্যে ছিলেন মার্কো পোলো। কারাগারে তিনি রাসটিসিয়ানো নামে এক কয়েদীকে তাঁর ভ্রমণ কথা বলেন। রাসটিসিয়ানো এই বৃত্তান্তটি টুকে রেখেছিলেন। পরে এই বৃত্তান্ত মার্কো

পোলোর ভ্রমণ কাহিনী নামে প্রচারিত হয় এবং সমগ্র ইউরোপে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে।

মার্কো পোলো তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে বলেন: মোঙ্গোল সম্রাটরা ছিলেন জ্ঞানপিপাসু, বিশেষ করে কুবলাই খানের রাজসভা দেশ-

মার্কো পোলো

বিদেশের জ্ঞানীগুণীদের জন্য উন্মুক্ত থাকত। একবার ভেনিস শহরের দুজন বণিক—নিকোলো পোলো ও মাফিও পোলো, কুবলাই খানের এক দূতের অনুরোধে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে চীনের রাজধানীতে যান। কুবলাই খান তাদের পেয়ে খুব খুশী হন এবং খ্রীস্ট ধর্ম সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করেন। তিনি মোঙ্গোলদের মধ্যে খ্রীস্ট ধর্ম প্রচার করতে মনস্থ করেন এবং একশ জন খ্রীস্টান পণ্ডিতকে তাঁর দরবারে আনবার জন্য পোলো ভাইদের ইওরোপে ফেরত পাঠান। কিন্তু খ্রীস্টান পণ্ডিতরা চীনে যেতে রাজী না হওয়ায়, দু-বছর বাদে দুজন খ্রীস্টান সন্ন্যাসীকে নিয়ে পোলো-রা আবার চীনে যান। এবার তাদের সঙ্গী ছিল নিকোলো পোলোর সতেরো বছরের পুত্র মার্কো পোলো। বহু বিপদ অতিক্রম করে দুস্তর গোবি মরুভূমি পার হয়ে তাঁরা পিকিং পৌঁছেন। পথে মার্কো মোঙ্গোলদের ভাষা শিখেছিলেন। মার্কোকে

কুবলাই খানের খুব ভাল লাগে এবং তিনি তাঁকে হ্যাংচাও শহরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। আরও বহু সহকারী কাজে তিনি তাঁকে
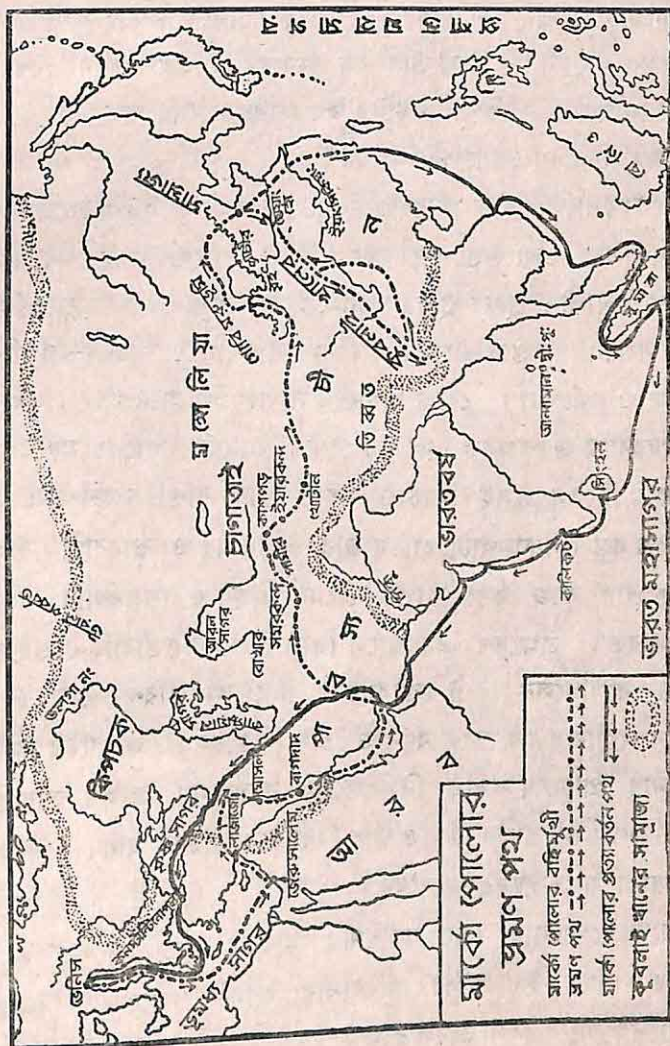
নিযুক্ত করেছিলেন। প্রায় সতেরো বছর চীনে থাকার পর পোলোরা জলপথে সুমাত্রা, ভারতবর্ষ ইত্যাদি দেশ ঘুরে পারস্যে যান এবং সেখান থেকে চলে যান নিজের দেশে। দেশে মোঙ্গোল পোষাক পরিহিত

পোলেদের কেউই চিনতে পারে না। তখন আত্মীয়-বন্ধুদের নিজেদের কথা বিশ্বাস করাবার জন্য তাঁরা এক ভোজে নিমন্ত্রণ করেন। ভোজসভায় তাঁরা বিদেশী পোষাক খুলে ফেলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে মহামুল্য হীরা, পান্না, মণি, জহরত। মার্কো চীনদেশে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলতে থাকেন। কিন্তু তাঁর বন্ধুবান্ধবদের সে কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস-যোগ্য মনে হয়নি। বিপুল ঐশ্বর্যের জন্য তারা মার্কোর নাম দিয়েছিলেন 'মার্কো মিলিয়ন' বা কোটিপতি মার্কো।

মার্কো পোলো তাঁর বিবরণীতে বলেছিলেন, তখন পিকিংয়ের নাম ছিল কাম্বালাক এবং উত্তর চীনের নাম ছিল ক্যাথে। চীনদেশ ছিল খুবই সমৃদ্ধিশালী ; সুন্দর সুন্দর বাগান, মাঠ, আঙ্গুর ক্ষেত ছড়িয়ে ছিল দেশের সর্বত্র। রাস্তার ধারে ধারে ছিল সরাইখানা ; শহরগুলো ছিল জনবহুল ও কর্মচঞ্চল। বৌদ্ধ বিহারের সংখ্যা ছিল অনেক। রাজধানী ও রাজদরবারে জাঁকজমক ছিল খুব বেশী। মার্কো পোলো যেখানকার শাসনকর্তা ছিলেন, সেই হ্যাংচাও শহরে পাকা রাস্তা, চওড়া খাল, বহু সেতু, বড় বড় দোকানপাট, হাট-বাজার, গুদাম ঘর ও স্নানবাপী ছিল। সোনারূপোর কাজ করা কাপড় চীনের ঐশ্বর্য ও শিল্পকলার মহিমা প্রচার করত। ব্রহ্মদেশ ভ্রমণকালে তিনি বিশাল হস্তীবাহিনী ও সৈন্য বাহিনী দেখেছিলেন। ঐ হস্তীবাহিনী মোঙ্গোল তীরন্দাজদের হাতে কিভাবে পরাজিত হয়, তার বর্ণনাও তিনি দিয়েছেন। জাপানের সমৃদ্ধি ও সোনার প্রাচুর্যের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। দক্ষিণ ভারতের এক শক্তিশালিনী রাণীর কথাও তাঁর বিবরণীতে পাওয়া যায়। সেখানে তিনি ভারতীয় যোগীদেরও দেখেন।

মার্কো পোলোর ভ্রমণ কাহিনীর মাধ্যমে প্রাচ্য দেশের বিপুল ঐশ্বর্যের পরিচয় ইওরোপের অধিবাসীরা জানতে পারে এবং তাদের ভৌগোলিক অনুসন্ধিৎসা প্রবল হয়ে ওঠে। বিখ্যাত অভিযাত্রী কলম্বাস এই ভ্রমণ কাহিনী পড়েই ভারত আবিষ্কারে উৎসাহী হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মধ্যযুগের জাপান (Japan in Medieval peirod) :

পৃথিবীর সবচেয়ে পূর্বের দেশ জাপান। জাপান দেশটি অসংখ্য ছোট বড় দ্বীপের সমষ্টি। এর মধ্যে চারটি দ্বীপ প্রধান। **হোন্‌সু, শিকোকু, কিয়ুসু** আর **হোক্কাইডো**। সমগ্র জাপানের আয়তন আমাদের ভারতবর্ষের আট ভাগের এক ভাগ।

জাপানীরা মোঙ্গল জাতিভুক্ত লোক। ঐতিহাসিকরা মনে করেন পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরের নানা অঞ্চলের অধিবাসীরা কয়েক হাজার বছর আগে জাপানে বসতি স্থাপন করে বর্তমান জাপানী জাতির সৃষ্টি করেছ। দেশের নাম জাপান পরে দেওয়া হয়। প্রায় ৫০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে জাপানে ইয়ামাতো নামে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময় থেকেই জাপান **ইয়ামাতো** নামে পরিচিত ছিল। চীনের অধিবাসীরা জাপানকে বলত সূর্যোদয়ের দেশ। জাপানীরা সেই থেকে নিজেদের দেশকে **দাই নিপ্পন** বা 'উদীয়মান সূর্যের দেশ' বলতে থাকে। মার্কোপোলো তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে জাপানের কথা উল্লেখ করেন 'চিপাংগো' নামে। সম্ভবতঃ জাপান কথাটি চিপাংগো কথার অপভ্রংশ।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতই মধ্যযুগে জাপানে **সামন্ততান্ত্রিক সমাজ** ও **অর্থনৈতিক ব্যবস্থা** প্রচলিত ছিল। মধ্যযুগের সূচনায় জাপানে বাস করত স্বাধীন, সম্পন্ন কৃষকশ্রেণী এবং বংশানুক্রমিক ভাবে

পরাধীন কৃষকদের নিম্নতর শ্রেণী ও দাসরা। এই সময় গোষ্ঠীর নায়কদের মধ্যে থেকে বংশ পরম্পরাগত জমির মালিক অভিজাত সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। এরাই ছিল দেশের অধিকাংশ জমি ও ধন-সম্পত্তির মালিক। নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়াবার জন্য এই জমিদার শ্রেণী সব সময় নিজেদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকত। এদের বলা হত **দাইমিও**। জাপানী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় প্রধান ছিলেন সম্রাট বা **মিকাডো**। তিনি দেশের সর্বোচ্চ শাসক হলেও তাঁর প্রকৃত কোন ক্ষমতা ছিল না। যে অভিজাত জমিদার বংশ সবচেয়ে বেশী ক্ষমতাশালী তাদের পরামর্শ মেনে চলা ছাড়া সম্রাটের কোন উপায় থাকত না।

জাপানী সভ্যতা ও সংস্কৃতি চীনের সভ্যতার কাছে বহুল পরিমাণে ঋণী। চীনের সুপ্রাচীন সভ্যতা নানাদিক থেকে জাপানকে প্রভাবিত করেছে। ভৌগোলিক নৈকট্যের ফলে জাপান সহজেই চীনদেশীয় সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। জাপানী জাতির বৈশিষ্ট্য হল অসাধারণ অনুকরণপ্রিয়তা। প্রায় সর্ব বিষয়ে জাপান চীনকে অনুকরণ করত। আনুমানিক ৫০০ খ্রীস্টাব্দে জাপান চীনের লিখিত ভাষা গ্রহণ করে। ইয়ামাতো রাজ্যের সঙ্গে কোরিয়ার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এই কোরিয়া দেশের মাধ্যমেই চীন থেকে বৌদ্ধধর্ম জাপানে ছড়িয়ে পড়ে। জাপান ও চীনের মধ্যে প্রায়ই দূত বিনিময় হত। বিশেষ করে চীনের তাং বংশের শাসনকালে চীনের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছিল জাপানের আদর্শস্থানীয়। চীনের রাজধানী চ্যাং-আন-এর অনুকরণে জাপান **নারা** নামে একটি রাজধানী-শহর গড়ে তোলে। জাপান চীনের সভ্যতা ও সংস্কৃতি অনুকরণ করলেও জাপানী সমাজে একটি ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। চীনারা সমাজে সৈনিকদের কোনদিনই উচ্চ স্থান দেয় নি, কিন্তু জাপানী সমাজে সৈনিক শ্রেণীই উচ্চ স্থান লাভ করে এসেছে। জাপানী ছাত্ররা চীনে উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে যেত। এদের মাধ্যমে চীনদেশীয় সংস্কৃতি জাপানে দ্রুত বিস্তার লাভ করে।

মধ্যযুগে মুষ্টিমেয় কয়েকটি অভিজাত জমিদার বংশ জাপানে প্রকৃত

ক্ষমতার মালিক ছিল। রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের জন্য এদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা লেগে থাকত। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ দিকে প্রথমে সমগ্র জাপানে ক্ষমতা বিস্তার করে শোগা বংশ। তাদের সময়ে বৌদ্ধধর্ম জাপানের রাজধর্মে পরিণত হয়। এই বংশের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রধান ছিলেন শোতোকু তাইশি। তিনি ছিলেন মধ্যযুগের জাপানের একজন বিখ্যাত সংস্কারক। তিনি চীনের অনুকরণে জাপানে শাসন সংস্কারের চেষ্টা করেছিলেন এবং গোষ্ঠী নেতাদের ওপর সম্রাটের শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছিলেন।

শোতোকু তাইশির পর শোগাবংশের পতন ঘটে। কামাটোরী নামে একজন গোষ্ঠী নেতা জাপানে ফুজিওয়ারা বংশের প্রাধান্য স্থাপন করেন। তিনি চীনদেশের অনুকরণে শাসন সংস্কার করেছিলেন। কামাটোরীর আমলে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা অনেকটা সুসংবদ্ধ হয়। কিন্তু সম্রাট ছিলেন এই বংশের হাতের পুতুল। এই সময় নারা শহরে জাপানের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। কামাটোরীর বিভিন্ন সংস্কার জাপানের ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করে। রাজধানীর নামানুসারে এই যুগকে বলা হয় নারা যুগ। এই যুগে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ব্যাপক সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটে। খনি ও শহরাঞ্চলের বিকাশলাভ ঘটে। আইনগুলো বিধিবদ্ধ হয়। ৭৯৪ খ্রীস্টাব্দে কিয়োটো নগরীতে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। তখন থেকে ১১০০ বছর ধরে কিয়োটো ছিল জাপানের রাজধানী। বর্তমানে জাপানের রাজধানী টোকিও।

বহু বছর ধরে ফুজিওয়ারা বংশ জাপানে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে। সম্রাটরা ছিলেন তাদের হাতের পুতুল। দ্বাদশ শতাব্দীতে জাপানের তাইরা এবং মিনামাতো নামে দুটি ক্ষমতাসম্পন্ন দাইমিও বা জমিদার বংশ উদ্ভব হয়।

সোগান ইয়েরিতোমো

তাইরা ও মিনামাতো বংশ যৌথভাবে ফুজিওয়ারা বংশকে

ক্ষমতাচ্যুত করে। এরপর উভয় বংশের মধ্যে শুরু হয় ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বে তাইরা বংশকে পরাজিত করে **ইয়োরিতোমো** মিনামাতো বংশকে জয়ী করেন। ১১৯২ খ্রীস্টাব্দে জাপানের সম্রাট ইয়োরিতোমোকে জাপানের **সোগান** বা 'প্রধান সেনাপতি' উপাধিতে ভূষিত করেন। এই সময় থেকে সোগানপদ বংশানুক্রমিক ভাবে চলতে থাকে এবং সোগানরাই হয় জাপানের প্রকৃত শাসনকর্তা।

জাপানের প্রাচীন ধর্মকে বলা হয় **শিন্টোধর্ম** বা 'দেবতাদের আচরিত পন্থা'। এই ধর্মে প্রকৃতি ও পূর্বপুরুষদের পূজো করার একটা মিশ্র প্রথা দেখা যায়। শিন্টোধর্ম মূলতঃ একটি যোদ্ধাজাতির ধর্ম। এই ধর্মের জোরে জাপানে প্রাচীন রোমের মত দেশের লোককে সম্রাটের প্রতি আনুগত্য ও ভক্তি শেখানো হয়েছে। জাপানরা মনে করে তাদের সম্রাট বংশ সূর্যদেবী আমাতেরাসু থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এইজন্য সম্রাটকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করা শিন্টো ধর্মবিশ্বাসের অঙ্গ। জাপানের সম্রাট বা মিকাডো একই সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক প্রধান এবং ধর্মীয় প্রধান ছিলেন। তিনি ছিলেন শিন্টোবাদের প্রধান পুরোহিত। কিন্তু জাপানী সম্রাট রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রধান হলেও প্রকৃত ক্ষমতা তাঁর ছিল না। জাপানী সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীসমাজে বিভিন্ন অভিজাত গোষ্ঠী বংশপরম্পরায় প্রকৃত ক্ষমতা ভোগ করত। সামন্ত প্রভুরা ছাড়াও জাপানে সামন্ত প্রথায় গড়ে ওঠা বৌদ্ধ মঠগুলোর ক্রমবর্দ্ধমান ক্ষমতা সম্রাটের ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। বৌদ্ধ মঠগুলো ছিল প্রভূত পরিণাম ভূসম্পত্তির অধিকারী এবং মঠ-প্রধানরা ছিলেন সাধারণতঃ শক্তিশালী সামন্তপ্রভুদের সহযোগী। ফলে সম্রাট এবং কেন্দ্রীয় শক্তির বিশেষ কোন ক্ষমতাই ছিল না।

১১৯২ খ্রীস্টাব্দে জাপানে **সোগান প্রথা** প্রচলিত হয়। এই সোগান পদ ছিল বংশানুক্রমিক। সোগানরা ছিলেন জাপানের সামরিক শাসনকর্তা। জাপানের সম্রাট ইয়েরিতোমোকে জাপানের প্রথম সোগান রূপে মনোনীত করেন। প্রায় সাতশো বছর ধরে সোগানরা সম্রাটের নামে জাপানের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। ইয়েরিতোমো কামাকুরা

নামক স্থানে তার সামরিক রাজধানী স্থাপন করেন। এজন্য তাঁর প্রতিষ্ঠিত সোগান বংশকে বলা হয় **কামাকুরা সোগান বংশ**। এই বংশের শাসনকালে দেশে শান্তি ও সুনিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৩৩৮ খ্রীস্টাব্দে **আশিকাগা** নামে এক নতুন সোগান বংশের শাসনকাল শুরু হয়। গৃহযুদ্ধ ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ছিল এযুগের বৈশিষ্ট্য। এদের সময়ে চীনে মিঙ্গ বংশ রাজত্ব করছিল। এই সময় চীনের সঙ্গে জাপানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। দীর্ঘ দিন গৃহযুদ্ধের পর তিনজন ব্যক্তি জাপানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এরা হলেন নোবুনাগা নামে একজন জমিদার বা দাইমিও, হিদেযোশী নামে একজন কৃষক নেতা এবং তোকুগাওয়া ইয়েযাশু নামে একজন শক্তিশালী জমিদার। এদের মধ্যে ইয়েযাশু সপ্তদশ শতকের প্রমথদিকে **তোকুগাওয়া** সোগান বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

জাপানে ভারতীয় ক্ষত্রিয়দের মতো একদল শক্তিশালী সম্ভ্রান্ত সামরিক সম্প্রদায় ছিল। তাদের বলা হত **সামুরাই**। সাধারণতঃ এরা ছিলেন দাইমিও বা জমিদারদের অধীন যোদ্ধার দল অত্যন্ত সাহসী ও বীর বলে সামুরাইদের খ্যাতি ছিল। কোমরের তুপাশে তুটি তলোয়ার ঝুলিয়ে তারা ঘুরে বেড়াত। নিয়ম ছিল, তলোয়ার একবার খাপ থেকে বার করলে তাকে রক্তপান না করিয়ে খাপে পোরা চলবে না। সামুরাইরা ছিল অনেকটা ইওরোপীয় নাইটদের মতো। সামুরাইরা নিজ নিজ প্রভুর প্রতি আমৃত্যু অনুরক্ত থাকত। সামুরাইদের বীরধর্ম প্রথাকে জাপানী ভাষায় বলা হত **বুশিডো**। নিজের অথবা দেশের সম্মান রক্ষার জন্য সামুরাইরা প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত ছিল না। অপমানিত হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে তারা হারাকিরি বা ছোরা দিয়ে পেট চিরে আত্মহত্যা করা ভাল মনে করত।

সামুরাই

অনুশীলনী

প্রথম পরিচ্ছেদ

১। তাং যুগে চীন কিভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়? এ যুগের আইন সংস্কার সম্বন্ধে কি জান?

২। তাং যুগে চীনের সাংস্কৃতিক বিকাশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৩। তাং যুগের চীনে কৃষি ও ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৪। চীনে বৌদ্ধধর্ম বিস্তার সম্বন্ধে কি জান?

৫। সুং যুগের বিভিন্ন সংস্কার কার্যের পরিচয় দাও।

৬। সুং যুগের শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৭। ইউয়ান রাজবংশ কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়? এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?

৮। মার্কো পোলো কে ছিলেন? তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণনা কর।

৯। টীকা লেখ:

সম্রাট তাই-সুং, হিউয়েন সাঙের ভারত ভ্রমণ, ওয়াং আনশি, চেঙ্গিস খান।

১০। কম কথায় উত্তর দাও:

(ক) প্রথম তাং সম্রাট কে ছিলেন?

(খ) লি পো কে ছিলেন?

(গ) পৃথিবীর প্রাচীনতম ছাপানো বই কোনটি?

(ঘ) চীনের কোন রাজবংশের আমলে বসন্ত রোগের টীকা আবিষ্কৃত হয়েছিল?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১। প্রাচীন জাপান কি নামে পরিচিত ছিল? জাপানীরা নিজেদের দেশকে কি নামে অভিহিত করে?

২। মধ্যযুগে জাপানে কি ধরণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল? দাইমিও কাদের বলা হয়?

৩। জাপানের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ওপর চীনের কিরূপ প্রভাব ছিল?

৪। জাপানের সম্রাটকে কি বলা হত? তাঁর ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষমতা কিরূপ ছিল?

৫। কবে ও কিভাবে জাপানে সোগান প্রথা প্রচলিত হয়?

৬। টীকা লেখ:

শোতোকু তাই শি, ইয়েরিতোমো, শিন্টোধর্ম, সামুরাই, কামাকুরা সোগানবংশ।

একাদশ অধ্যায়

॥ মধ্যযুগের ভারতবর্ষ ॥

(India in the Middle Ages)

গুপ্তোত্তর ভারত (পঞ্চম থেকে সপ্তম শতাব্দী)

(India, after the Guptas)

হুণ জাতি মধ্যে এশিয়ার অধিবাসী। খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে হুণ জাতি উত্তর পশ্চিম চীন থেকে ইউ-চি জাতিকে বিতাড়িত করেছিল। কিছুকাল পরে হুণ জাতি পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়। হুণদের একটি শাখা ধীরে ধীরে ইওরোপে উপস্থিত হয় এবং নিষ্ঠুর ভাবে রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস করে। অপর একটি শাখা খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে অক্ষু নদীর উপত্যকায় বসতি স্থাপন করে। এই শাখা শ্বেত হুণ নামে পরিচিত। হিন্দুকুশ অতিক্রম করে তারা গান্ধার জয় করেছিল। **শ্বেত হুণরা গুপ্ত সম্রাট স্কন্দ গুপ্তের রাজত্বকালের (৪৫৫—৪৬৭ খ্রীঃ) প্রথম দিকে, ৪৫৮ খ্রীস্টাব্দে, গুপ্ত সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমান্ত আক্রমণ করে।** কিন্তু স্কন্দ গুপ্ত তাদের পরাজিত করেন। তিনি ছিলেন গুপ্তবংশের শেষ পরাক্রমশালী সম্রাট। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন হুণরা গুপ্ত সাম্রাজ্যের সীমা লঙ্ঘন করতে পারেনি। ৪৮৪ খ্রীস্টাব্দে হুণরা শাশানিয় রাজ ফিরোজকে হত্যা করে ধীরে ধীরে কাবুল ও পারস্য অধিকার করে। এইভাবে তারা একটি বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলে এবং অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল বল্‌খ্।

স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। এই সময় হুণরা আবার ভারত আক্রমণ করে। হুণদের প্রথম বিখ্যাত দলপতির নাম তোরমান। পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে তিনি আক্রমণ শুরু করেন এবং পাঞ্জাব ও পশ্চিম ভারতের কিছু অংশ দখল করেন। মধ্য-মালব পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়েছিল। তিনি গুপ্তরাজ ভানুগুপ্ত

কর্তৃক পরাজিত হয়েছিলেন। তোরমানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র **মিহিরকুল হুণদের** রাজা হন। তিনি ছিলেন যেমন দুর্ধর্ষ, তেমনি হিংস্র ও অত্যাচারী। তিনি বহু বৌদ্ধমঠ ধ্বংস করেন। গোয়ালিয়র পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়েছিল। কিন্তু তিনি মান্দাশোরের রাজা যশোধর্মণ এবং গুপ্তসম্রাট নরসিংহ গুপ্ত বালাদিত্য কর্তৃত দু'বার পরাজিত হন। পরাজিত মিহিরকুল কাশ্মীরে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং বিশ্বাস-ঘাতকতা করে কাশ্মীরের সিংহাসন দখল করেন। মিহিরকুলের রাজধানী ছিল পশ্চিম পাঞ্জাবের শাকল বা শিয়ালকোট নামক স্থানে। ৫৪২ খ্রীস্টাব্দে মিহিরকুলের মৃত্যুর পর হুণরা নেতা শূন্য হয়ে পড়ে। ফলে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা কমে আসে। কিন্তু খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম ভারত ও মালবের নানাস্থানে হুণরা ভারতীয় রাজাদের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত ছিল। সপ্তম শতাব্দীতে থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশের রাজারা হুণদের পরাজিত করেন। হুণরা ধীরে ধীরে ভারতীয় ভাষা ও ধর্ম গ্রহণ করে এবং ক্রমশঃ রাজপুত জাতির মধ্যে মিশে যায়।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর **হুণ আক্রমণ উত্তর-পশ্চিম ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা**। হুণ আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্য ও তার শাসন ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয় এবং এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে বহু ছোট ছোট রাজ্য গড়ে ওঠে। এইভাবে সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যের ধারা বিলুপ্ত হয়। সামাজিক দিক থেকে ভারতীয় জনসমাজে হুণ-গুর্জর ইত্যাদি বিদেশী জাতিগুলোর সংমিশ্রণের ফলে ক্ষত্রিয় রাজপুতদের অভ্যুত্থান ঘটে।

গুপ্ত সম্রাটদের শাসনকালে উত্তর ভারতে যে রাজনৈতিক সংহতি স্থাপিত হয়েছিল, সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তা ভেঙ্গে পড়ে এবং ভারত বহু ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। হর্ষবর্ধনের রাজত্ব-কালের পূর্ব পর্যন্ত উত্তর ভারতের প্রায় সর্বত্র রাজনৈতিক অনৈক্য লক্ষ্য করা যায়। উত্তর-পশ্চিম ভারতে পাঞ্জাব ও মালবে যে হুণ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, মিহিরকুলের মৃত্যুর পর তার পতন ঘটে। হুণ-

জাতির একটি শাখা গুর্জরজাতি রাজপুতনায় স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেছিল। সৌরাষ্ট্রে অবস্থিত ছিল মৈত্রক বংশ শাসিত বলভী রাজ্য। উত্তর ভারতের অন্যান্য স্বাধীন রাজা ও রাজ্যের মধ্যে গৌড় রাজ শশাঙ্ক, কামরূপরাজ ভাস্করবর্মণ, মান্দাশোররাজ যশোধর্মণ, কনৌজের মৌখরী বংশ, থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশ উল্লেখযোগ্য। থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশের রাজা প্রভাকরবর্ধন হুণ, গুর্জর প্রভৃতি জাতিকে পরাজিত করে পরাক্রমশালী হয়েছিলেন। তিনি কনৌজের মৌখরী বংশে নিজ কন্যা রাজ্যশ্রীর বিবাহ দেন। এই ভাবে উভয় রাজবংশের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হয়। প্রভাকরবর্ধনের কনিষ্ঠ পুত্র হর্ষবর্ধন থানেশ্বর এবং কনৌজ উভয়রাজ্যের উত্তরাধিকার লাভ করেছিলেন। সপ্তম শতাব্দীতে উত্তর ভারতের একটি বিরাট অঞ্চলে তিনি তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন।

হর্ষবর্ধন ঃ ঐক্যবদ্ধ উত্তর ভারতের অধীশ্বর ঃ কুরুক্ষেত্রের কাছে থানেশ্বর নামক রাজ্যে পুষ্যভূতি বংশ রাজত্ব করত। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে প্রভাকরবর্ধনের অধীনে থানেশ্বরের শক্তি ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। কনৌজের মৌখরীরাজ গ্রহবর্মনের সঙ্গে তিনি নিজকন্যা রাজ্যশ্রীর বিবাহ দিয়েছিলেন। ৬০৫ খ্রীস্টাব্দে প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রাজ্যবর্ধন রাজা হন। ইতিমধ্যে গৌড়রাজ শশাঙ্ক এবং মালবরাজ দেবগুপ্ত কেনৌজ রাজ গ্রহবর্মনকে পরাজিত ও নিহত করেন এবং রাজ্যশ্রী বন্দনী হন। এই সংবাদ পেয়ে রাজ্যবর্ধন রাজ্যশ্রীকে উদ্ধারের জন্য কনৌজ গেলে শশাঙ্ক কর্তৃক নিহত হন। এইভাবে গ্রহবর্মন ও রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর ফলে কনৌজ ও থানেশ্বর উভয় রাজ্যের সিংহাসন শূন্য হয়। মন্ত্রীদের অনুরোধে প্রভাকরবর্ধনের কনিষ্ঠ

হর্ষবর্ধন

পুত্র হর্ষবর্ধন উভয় রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন (৬০৬ খ্রীস্টাব্দে) এই সময় থেকে হর্ষাব্দের গণনা শুরু হয়। তিনি কনৌজে রাজধানী স্থাপন করেন।

হর্ষবর্ধন ছিলেন দিগ্বিজয়ী সম্রাট। ভ্রাতৃহন্তা শশাঙ্ককে দমন করবার জন্য তিনি কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার সঙ্গে মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হন। কিন্তু শশাঙ্কের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধের ফলাফল জানা যায় না। সম্ভবতঃ তিনি শশাঙ্ককে পরাজিত করতে পারেন নি। এরপর হর্ষ অমিতবিক্রমে রাজ্যবিস্তার করে চলেন। বলভীরাজ ধ্রুবসেন তাঁর কাছে পরাজিত হন। একে একে তিনি মগধ ও উড়িষ্যা জয় করেন। 'মগধরাজ' উপাধি গ্রহণ করে তিনি চীন সম্রাটের কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন। সম্ভবতঃ সিন্ধুদেশ, কাশ্মীর প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্য তাঁর আধিপত্য স্বীকার করে নিয়েছিল। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে রাজ্যবিস্তার করতে গিয়ে তিনি বাধা পান। চালুক্য বংশের দ্বিতীয় পুলকেশী তাঁকে পরাস্ত করেন।

প্রায় সমগ্র উত্তর ভারত জুড়ে গড়ে উঠেছিল হর্ষের সাম্রাজ্য। পূর্বে বঙ্গদেশ থেকে শুরু করে পশ্চিমে পাঞ্জাব পর্যন্ত এক বিরাট ভূ-খণ্ডের অধীশ্বর ছিলেন তিনি। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী তাঁকে সমগ্র উত্তরাপথের একচ্ছত্র অধিপতি (সকলোত্তরপথনাথঃ) বলে স্বীকার করেছেন। পূর্বে কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মা ও পশ্চিমে বলভীর রাজা ধ্রুবসেন তাঁর প্রাধান্য স্বীকার করতেন। এইভাবে প্রাচীন যুগের সমগ্র ভারতব্যাপী বা আসমুদ্রহিমাচল ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আদর্শ শুধুমাত্র উত্তর ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

হর্ষ স্বয়ং তাঁর সাম্রাজ্যের শাসনকার্য পরিদর্শন করতেন এবং প্রায়ই রাজ্য পরিভ্রমণ করতেন। সাম্রাজ্য কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। গ্রাম ছিল শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি। উৎপন্ন ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ রাজস্ব হিসেবে আদায় করা হত ; দণ্ডবিধি ছিল কঠোর। হর্ষ অহিংসা নীতি প্রচলন করেছিলেন।

সুদীর্ঘ ৪১ বছর রাজত্ব করার পর, ৬৪৭ খ্রীস্টাব্দে হর্ষবর্ধন মারা যান।

তিনি ছিলেন মধ্যযুগের ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি ছিলেন একাধারে সুদক্ষ যোদ্ধা, সুশাসক, প্রজাহিতৈষী, সাহিত্যিক এবং ধর্ম প্রচারক। তাঁর সভাসদ্ বাণভট্ট **হর্ষচরিত ও কাদম্বরী** নামে তুটি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। 'হর্ষচরিত' মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইতিহাস গ্রন্থ। হর্ষ স্বয়ং 'নাগানন্দ', 'রত্নাবলী' ও 'প্রিয়দর্শিকা' নামে তিনটি নাটক রচনা করেছিলেন। প্রথম জীবনে শৈব হলেও তিনি পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। মহারাজ অশোকের মত তিনি বুদ্ধের নীতিগুলো প্রচার করার ব্যবস্থা করেন। বহু বৌদ্ধ মঠ তিনি নির্মাণ করিয়েছিলেন। চিকিৎসালয়, বিশ্রামাগার, জলাশয় প্রভৃতি জনহিতকর কাজের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর দানশীলতা ভারতের ইতিহাসে অতুলনীয়।

হিউয়েন সাঙের ভ্রমণ ও বিবরণী ঃ হর্ষের রাজত্বকালে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ ভারতে এসেছিলেন। মানুষের জ্ঞান পিপাসা ও ধর্মানুরাগ যে কত প্রবল হতে পারে, হিউয়েন সাঙ্ তার উজ্জল দৃষ্টান্ত। মহান সংস্কৃতি ক্ষেত্র ও বুদ্ধের লীলাভূমি ভারতবর্ষকে দেখবার জন্য হিউয়েন সাঙ্ সুদূর চীনদেশ থেকে ভারতে এসেছিলেন বহু বিপদ অতিক্রম করে, অবর্ণনীয় তুঃখ কষ্ট হাসিমুখে সহ্য করে।

হিউয়েন সাঙ্

উত্তর নেপাল থেকে দক্ষিণ সিংহল পর্যন্ত অঞ্চল তিনি দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে ভ্রমণ করেন। তাঁর ভ্রমণ কাহিনীর নাম **"সি ইউ কি"** বা পশ্চিম জগতের বিবরণ। চীনের দৃষ্টিতে ভারত ছিল পশ্চিম জগৎ।

হিউয়েন সাঙ্ হর্ষবর্ধন ও তাঁর শাসন প্রণালীর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি লিখেছেন হর্ষ ছিলেন প্রজাহিতৈষী। তাঁর রাজত্বে করভার ছিল লঘু। বিনা পারিশ্রমিকে বেগার খাটানো হতনা। রাজ্যে দস্যু তস্করের উপদ্রব ছিল। তিনি নিজেই কয়েকবার দস্যুর হাতে

পড়েছিলেন। দণ্ডবিধি ছিল কঠোর। হর্ষ বৌদ্ধ ধর্মের উন্নতি ও অহিংসা প্রচারের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

বৌদ্ধধর্মের তখন অবনতি আরম্ভ হয়েছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ধীরে ধীরে

প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। হর্ষের রাজধানী কনৌজ ছিল একটি সমৃদ্ধ নগরী। প্রাচীন পাটলিপুত্র, শ্রাবন্তী ইত্যাদি নগরী তখন ধ্বংসপ্রাপ্ত।

হিউয়েন সাঙ্ ১৩৮টি ভারতীয় রাজ্যের নাম করেছেন। তার মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ ছিল উত্তরে হর্ষবর্ধন এবং দক্ষিণে দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজ্য। মেগাস্থিনিস, ফা-হিয়েন ইত্যাদি বিদেশী পর্যটকদের মত তিনিও সাধারণ ভারতবাসীর চরিত্রের প্রশংসা করেছেন। তারা ছিল সৎ, সরল ও সাহসী। দুধ, মাখন, গম, যব, মাছ, হরিণ ও ভেড়ার মাংস তাদের প্রধান খাদ্য ছিল। পোশাক ছিল খুবই সাদাসিদে। মেয়েরা এবং অভিজাত পুরুষরা অলঙ্কার পরত। বিদ্বানদের জমি দান করার রীতি ছিল। ব্যবসা বাণিজ্য উন্নত ছিল। জলপথে ও স্থলপথে বাণিজ্য চলত। বাংলার তাম্রলিপ্ত ছিল একটি সমৃদ্ধ বন্দর।

হিউয়েন সাঙের বিবরণী তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের একটি তথ্যভাণ্ডার। ভারতের ইতিহাস তাঁর কাছে যে কত ঋণী তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ঃ হর্ষের রাজত্বকালে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি গৌরবের চরম শিখরে আরোহণ করেছিল। হিউয়েন সাঙ্ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিস্তৃতবিবরণ রেখে গেছেন। হর্ষের সময় এখানকার
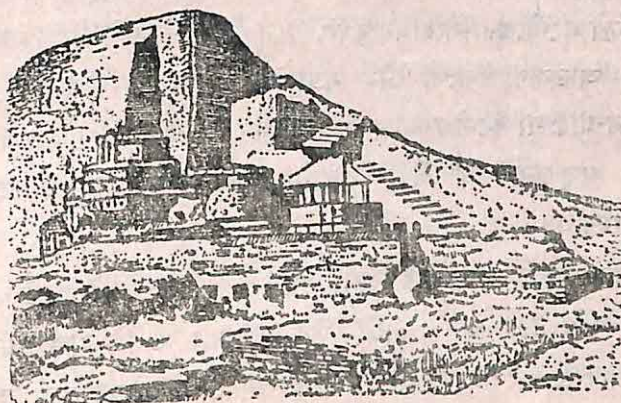
নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্র সংখ্যা ছিল দশ হাজার। চীন, তিব্বত, কোরিয়া প্রভৃতি এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে বিদ্যার্থীর দল এখানে আসত। স্বয়ং

হিউয়েন সাঙ্‌ ও কয়েক বছর এখানে শিক্ষা লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় বহন করতেন রাজা ও ধনী ব্যক্তিরা। ছাত্রদের কোন অর্থ ব্যয় করতে হত না। বৌদ্ধশাস্ত্র ও দর্শন ছাড়া, গণিত, রসায়ন, আয়ুর্বেদ, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষাদান করা হত। নালন্দায় একটি বিরাট পাঠাগার এবং ছতলা একটি প্রকাণ্ড ছাত্রাবাস ছিল। প্রত্যেক ছাত্রকে সমুচিত পরীক্ষার পর ভর্তি করা হত। নালন্দার অধ্যাপকগণ উচ্চ ক্ষমতা ও ধীশক্তির অধিকারী ছিলেন। হর্ষবর্ধনের সময়ে বাঙালী পণ্ডিত শীলভদ্র নালন্দার অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি ছিলেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা ভূয়সী প্রশংসা করেছেন হিউনেয় সাঙ্‌।

হর্ষোত্তর যুগ (অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী)
(Post-Harshavardhan Period)

৬৪৭ খ্রীস্টাব্দে হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। তিনি কোন উত্তরাধিকারী রেখে যান নি। সম্ভবতঃ অর্জুন নামে হর্ষের কোন মন্ত্রী কনৌজের সিংহাসন দখল করে নেন। তিনি চীন সম্রাটের দূতদের আক্রমণ করলে, চীন সম্রাটের জামাতা তিব্বতের রাজা **স্রং-সান-গাম্পো** কনৌজ আক্রমণ করেন। অর্জুন পরাজিত ও বন্দী হন। অর্জুনের পরবর্তী অধশতাব্দীকাল কনৌজের ইতিহাসের অন্ধকারময় যুগ।

হর্ষের মৃত্যুর পর তাঁর বিরাট সাম্রাজ্য বিভিন্ন ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। রাজনৈতিক অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলা এযুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। পরবর্তীকালে উত্তর ভারত হিন্দু রাজাদের অধীনে আর ঐক্যবদ্ধ হতে পারে নি। **হর্ষ-পরবর্তী যুগে উত্তর ভারতের ইতিহাস হল, অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী রাজ্যগুলোর ইতিহাস।** খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের প্রথমভাগে কনৌজে যশোবর্মন নামেএক পরাক্রান্ত রাজা একটি ক্ষণস্থায়ী সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। কবি বাক্‌পতি রচিত

গৌড়বহো কাব্যে যশোবর্মনের রাজত্ব ও যুদ্ধবিগ্রহ সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। এছাড়া কাশ্মীরের কার্কট বংশের রাজারও সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করেছিলেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়। এছাড়া উত্তর-পশ্চিম ভারতের গুর্জর প্রতিহার রাজবংশ কিছুকাল প্রবল হয়ে উঠেছিল। এই গুর্জর প্রতিহাররা রাজপুত বলে কথিত। প্রশ্ন হল ভারতের ইতিহাসে **রাজপুত কাদের বলা হয়।**

হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন অংশে রাজপুত জাতির বিভিন্ন শাখা প্রতিপত্তি লাভ করছিল। ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ মন্তব্য করেছেন, "হর্ষের মৃত্যুর পর মুসলমানগণ কর্তৃক হিন্দুস্থান বিজয় পর্যন্ত, অর্থাৎ মোটামুটি সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগ অবধি কয়েক শতাব্দী ধরে তারা এমনই প্রাধান্য অর্জন করেছিল যে এই সময়কালকে সঙ্গতভাবেই রাজপুত যুগ বলে উল্লেখ করা যেতে পারে।"

ভারতীয় রাজপুতগণ কোন একটি বিশেষ জাতি নয়। গুপ্তপূর্ব ও গুপ্তোত্তর যুগে শক, কুষাণ, হুণ, গুর্জর ইত্যাদি যে সব যোদ্ধ জাতি ভারতে প্রবেশ করেছিল, তারা কালক্রমে ভারতীয় রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার ও জাতিভেদ প্রথা গ্রহণ করে রাজপুত নামে পরিচিত হয়েছিল। আবার মধ্যভারতের আদিবাসীদের মধ্যে থেকেও অনেকে ক্রমে রাজপুত বলে গণ্য হয়। এইভাবে যাদের প্রধান বৃত্তি ছিল যুদ্ধ, তারা বিভিন্ন উপজাতি বা গোষ্ঠী থেকে এসেও মোটামুটি ক্ষত্রিয় বলে পরিগণিত হল এবং রাজপুত নামে অভিহিত হল। হর্ষের মৃত্যুর পর যে সব রাজপুত গোষ্ঠী উত্তর ভারতের বিভিন্ন অংশে রাজ্যস্থাপন করেছিল তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ হল গুর্জর-প্রতিহার রাজবংশ। অষ্টম থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত এই বংশ ছিল খুবই শক্তিশালী। দশম শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে এই বংশের পতন ঘটে। তখন উত্তর ভারতে অনেকগুলো ছোট ছোট রাজপুত রাজ্যের উদ্ভব হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মালবের পরমার বংশ, জেজাকভুক্তি

বা বুন্দেলখণ্ডের চন্দেল্ল বংশ, মধ্যভারতের চেদিবংশ, কনৌজের গহড়বাল বা রাঠোর বংশ, আজমীড়ের চৌহান বংশ, গুজরাটের চৌলুক্য বা সোলাঙ্কি বংশ ইত্যাদি। এরমধ্যে সবচেয়ে বেশী ক্ষমতাশালী ছিল **পরমার বংশ**।

হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্যের অবসান ঘটলেও, তাঁর রাজধানী কনৌজ ছিল তখনো ভারতের মধ্যমণি। কনৌজের আধিপত্য লাভ করাই ছিল উত্তর ভারতের রাজনৈতিক আধিপত্য লাভের নিদর্শন। ইওরোপে যেমন রোম বা কনস্ট্যান্টিনোপল শহরে অধিকার প্রতিষ্ঠা করা ছিল শক্তির মানদণ্ড, তেমনি এদেশে তখন ছিল কনৌজের স্থান। এই কনৌজের আধিপত্য লাভের জন্য অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে দশম শতাব্দা পর্যন্ত রাজপুতনার গুর্জর প্রতিহার বংশ, দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট বংশ এবং বাংলার পালবংশের রাজাদের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছিল। এই সংগ্রাম ইতিহাসে **ত্রি-শক্তির সংগ্রাম** নামে খ্যাত। এই সংগ্রামে শেষ পর্যন্ত গুর্জর প্রতিহারগণ বিজয়লাভ করেছিলেন। ৮১৬ খ্রীস্টাব্দে গুর্জর প্রতিহার রাজ দ্বিতীয় নাগভট কনৌজে তাঁর রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। তখন থেকে তাঁর বংশধরগণ প্রায় দুশো বছর ধরে কনৌজ তাদের দখলে রেখেছিলেন।

রাজপুত বংশোদ্ভূত গুর্জর প্রতিহাররা প্রায় দুশো বছর ধরে রাজত্ব করলেও সমগ্র উত্তর ভারতকে ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যে পরিণত করতে পারেন নি। গুর্জর প্রতিহারদের শাসন ব্যবস্থা ছিল সামন্ততান্ত্রিক। তাদের পতনের পর যে রাজপুত রাজ্য স্বাধীনভাবে উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল শাসন করতে থাকে, তারা প্রায় সকলেই ছিল প্রতিহারদের সামন্ত। সামন্তধর্মী সমাজে দীর্ঘকাল সকলকে একত্রিত রেখে সাম্রাজ্য সংগঠন তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির রক্ষকরূপে এবং বিদেশী মুসলমান আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে, ভারতের ইতিহাসে তাদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশ
(BENGAL)

প্রাচীন বাংলাদেশ কতকগুলো ছোট ছোট জনপদে বিভক্ত ছিল। রাঢ়, বরেন্দ্র, গৌড়, সমতট, বঙ্গ ইত্যাদি ছিল বিভিন্ন জনপদের নাম। এইসব জনপদের মধ্যে বঙ্গ ও গৌড় নাম দুটিই পরে সমগ্র বাংলাদেশের নাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মোটামুটিভাবে প্রাচীনকালে বাংলা বলতে বোঝাত বর্তমান পূর্ববঙ্গকে এবং গৌড় বলতে বোঝাত উত্তর-পশ্চিম বঙ্গকে।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতে যে সব স্থানীয় রাজ্য গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে গৌড় ছিল অন্যতম প্রধান। সপ্তম শতকের প্রারম্ভে **শশাঙ্ক** নামে একজন স্বাধীন নরপতি গৌড়ে রাজত্ব করতেন। তাঁর বংশ পরিচয় অজ্ঞাত। সম্ভবতঃ প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন কোন গুপ্ত রাজার সামন্ত। একটি শিলালিপিতে তাঁর আখ্যা দেওয়া হয়েছে **শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক**। ৬০৬ খ্রীস্টাব্দের পূর্বেই তিনি গৌড়ে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর রাজধানী ছিল বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত **কর্ণসুবর্ণ**। দণ্ডভূক্তি (মেদিনীপুর জেলা), উৎকল, কঙ্গোদ (গঞ্জাম জেলা), মগধ ও বঙ্গরাজ্য তিনি জয় করেছিলেন। তাঁর আগে আর কোন বাঙ্গালী রাজা এত বড় সাম্রাজ্য জয় করতে পারেননি। কূটনীতি ও যুদ্ধ নৈপুণ্যের দ্বারা তিনি কনৌজের মৌখরী রাজবংশ ধ্বংস করেন। প্রবল পরাক্রান্ত মহারাজ হর্ষবর্ধনও তাঁকে পরাজিত করতে পারেননি। শশাঙ্ক ছিলেন বাংলার প্রথম স্বাধীন ও শক্তিশালী নরপতি। তাঁর সময়ে বাংলাদেশ প্রথম উত্তর ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল। শশাঙ্ক ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী ছিলেন। হিউয়েন সাঙ্ তাঁকে বৌদ্ধধর্মের ঘোর শত্রু বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই উক্তি বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ, হিউয়েন সাঙের রচনা থেকেই জানা যায় যে, রাজধানী কর্ণসুবর্ণ এবং শশাঙ্কের রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের যথেষ্ট মর্যাদা ছিল।

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে। কামরূপের রাজা ভাস্কর বর্মণ সম্ভবতঃ বাংলাদেশের কিছু অংশ দখল করে নেন। বাংলার ইতিহাসে এক শতাব্দীকাল অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার যুগ চলতে থাকে। তারপর অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে অরাজকতার অবসানের জন্য বাংলার প্রজারা **গোপাল** নামে এক ব্যক্তিকে রাজপদে মনোনীত করেন। গোপাল পাল বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। পাল বংশ প্রতিষ্ঠিত হলে বাংলার ইতিহাস আবার গৌরবোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ধর্মপাল ও দেবপাল ছিলেন এই বংশের বিখ্যাত রাজা। দেবপালের পরবর্তী রাজারা অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীর সূচনায় সেন বংশের রাজারা বাংলাদেশে রাজত্ব করেন। এই বংশের রাজাদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন **বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেন**। দ্বাদশ শতকের শেষে তুর্কী আক্রমণে লক্ষ্মণ সেন পূর্ববঙ্গে পালিয়ে যান। সেখানে তাঁর বংশধররা বহুকাল রাজত্ব করেছিলেন।

পাল ও সেন বংশের আমলে বাংলাদেশের জীবন ও সমাজ:
পাল ও সেন রাজাদের রাজত্বকালে বাংলার ইতিহাসে স্মরণীয় যুগ। পাল বংশের রাজত্বকালে স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা হয় এবং সেই সময়েই বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতির সূত্রপাত ঘটে। শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, সমাজ, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পালযুগে চরম উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। সেন যুগে রাজনৈতিক প্রাধান্য কিছুটা কম হলেও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ ছিল অব্যাহত।

সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তখন সামন্ত প্রথা প্রচলিত ছিল। দেশ ছিল কৃষি নির্ভর। ভূমিস্বত্ব ভোগীদের আর্থিক অবস্থা উন্নত ছিল। সাধারণ কৃষক ও শ্রমিকদের আথিক অবস্থা উন্নত ছিল না। দেশের অধিকাংশ মানুষ বাস করত গ্রামে। ধান ছিল এখনকার মতই প্রধান শস্য। আখের চাষও হত। প্রচুর গুড় ও চিনি তৈরী হত এবং দেশ-বিদেশে রপ্তানী হত। বস্ত্র শিল্পের খুবই খ্যাতি ছিল। বিভিন্ন শিল্পী ও কারিগরদের নিজস্ব সংঘ ছিল। সমাজ ছিল ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ও শূদ্র এই কয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত। সেন বংশের রাজা বল্লাল সেন

সমাজে জাতিগত বিশুদ্ধতা বজায় রাখার জন্য কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন করেছিলেন। সমাজে নারী জাতির স্থান ছিল উচ্চে। অবরোধ প্রথা ছিল না। স্ত্রী শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

এখনকার মত ভাত, মাছ, ডাল শাকসব্জী, ফলমূল, দুধ ইত্যাদি ছিল প্রধান খাদ্য। পোষাক-পরিচ্ছদের কোন আড়ম্বর ছিল না। পুরুষরা মালকোঁচা দিয়ে খাটো ধুতি পরত আর মেয়েরা পরত গোড়ালি পর্যন্ত ঢাকা শাড়ি। মাঝে মাঝে মেয়েরা ওড়না আর পুরুষেরা উত্তরীয় বা চাদর ব্যবহার করত। উৎসব অনুষ্ঠানে বিশেষ পোষাকের প্রচলন ছিল। মেয়ে-পুরুষ উভয়েরই গয়না পরার রীতি প্রচলিত ছিল। মেয়েরা নানাধরনের কেশ বিন্যাস করত। কর্পূর, চন্দন, আলতা, সিঁদুর প্রভৃতি প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহৃত হত। চামড়ার চটি এবং কাঠের খড়ম ব্যবহার করা হত। লাঠি ছাতার প্রচলনও ছিল।

কুস্তি, শিকার, ব্যায়াম, আর বাজিকরের খেলা পুরুষদের খুবই পছন্দ ছিল। দাবা ও পাশাখেলাও চলত। নাচ, গান, অভিনয়ের খুবই প্রচলন ছিল। বীণা, বাঁশী, মৃদঙ্গ, ঢাক, ঢোল, করতাল প্রভৃতি ছিল বাদ্যযন্ত্র। এখনকার দিনের মতই দুর্গাপূজা বাঙ্গালী হিন্দুর প্রধান পর্ব ছিল। এছাড়া ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, জন্মাষ্টমী, অক্ষয়তৃতীয়া, গঙ্গাস্নান ইত্যাদিও প্রচলিত ছিল। গরু ও ঘোড়ার গাড়ি, হাতি, রথ, পাল্কি, নৌকা ইত্যাদি ছিল প্রধান যানবাহন।

পাল ও সেন রাজাদের আমলে সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়েছিল। পাল রাজত্বের শেষ দিকে কবি সন্ধ্যাকর নন্দী **রামচরিত** নামে সংস্কৃত ভাষায় এক উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করেন। সেনরাজ বল্লাল সেন সংস্কৃত ভাষায় **দানসাগর** ও **অদ্ভুতসাগর** নামে দুটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। সেন যুগের কবি জয়দেব সুললিত সংস্কৃত ভাষায় **গীতগোবিন্দ** নামে অমর কাব্য রচনা করেন। **পবনদূত** রচয়িতা ধোয়ী এবং উমাপতি ধর, হলায়ুধ প্রভৃতি পণ্ডিত লক্ষ্মণ সেনের আমলে বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন। পাল আমলের শিল্পী ধীমান ও বীতপাল পাথর ও ধাতুমূর্তি গড়ায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

পাল আমলের শিল্পরীতি নেপাল, তিব্বত, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোচীনে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

বাংলাদেশের সঙ্গে চীন ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বহু দেশের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। বাঙ্গালী বণিকরা সিংহল, ব্রহ্মদেশ, মালয়, জাভা, বালি, সুমাত্রা চম্পা, চীন ইত্যাদি বহু দূর দেশে যাতায়াত করত। সপ্তগ্রাম, তাম্রলিপ্ত ইত্যাদি ছিল সে যুগের প্রধান বন্দর।

ধর্ম ও শিক্ষাদীক্ষা: পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশ বৌদ্ধধর্ম-চর্চার বিরাট কেন্দ্রে পরিণত হয়। সেই সময় ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। পাল রাজাদের প্রচেষ্টায় মহাযান বৌদ্ধধর্ম তিব্বত ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় প্রসার লাভ করে। বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত অতীশ দীপঙ্কর পালযুগে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। পাল রাজগণ বিক্রমশীলা, ওদন্তপুর, সোমপুর ইত্যাদি স্থানে কয়েকটি বিখ্যাত বৌদ্ধ মঠ স্থাপন করেন। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও পাল রাজারা ধর্মের ব্যাপারে ছিলেন উদার।

পালযুগের চিত্র

সেন রাজারা ছিলেন হিন্দু। তাঁরা ছিলেন শিব ও বিষ্ণুর উপাসক। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম তিব্বত, নেপাল, আরাকান ইত্যাদি অঞ্চলে প্রসার লাভ করে। এই সময় পৌরাণিক হিন্দুধর্ম দ্রুত প্রসার লাভ করে এবং শিব, বিষ্ণু, পার্বতী প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা প্রচলিত হয়।

পালযুগ শুরু হবার কিছু আগে, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন

সাঙ্ বাংলাদেশ ভ্রমণ করেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন বাংলার মানুষ শিক্ষার জন্য একান্ত আগ্রহশীল। তারা জ্ঞানলাভের জন্য সুদূর কাশ্মীর পর্যন্ত যেত। পাল রাজারা শিক্ষা বিস্তারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিহারগুলোর মধ্যে বিক্রমশীলা ও ওদন্তপুর মহাবিহার প্রসিদ্ধ।

পালরাজ ধর্মপাল বর্তমান ভাগলপুরের কাছে **বিক্রমশীলা** মহাবিহার স্থাপন করেছিলেন। এই মহাবিহারে ১০৭টি মন্দির ও ৬টি মহাবিদ্যালয় ছিল। বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র, ন্যায়, ব্যাকরণ, তর্কবিদ্যা, চিকিৎসা-শাস্ত্র প্রভৃতি এখানে শিক্ষা দেওয়া হত। তিন হাজার বিদ্যার্থীর অধ্যয়ন ও বাসস্থানের ব্যবস্থা ছিল। বিদ্যার্থীদের ব্যয় মহাবিহার থেকেই বহন করা হত। নেপাল, তিব্বত, সুবর্ণ-ভূমি ইত্যাদি দেশ থেকে বহু বিদ্যার্থী আসতেন। তৎকালীন বিখ্যাত পণ্ডিতরা এখানে অধ্যাপনা করতেন। **অতীশ দীপঙ্কর** ছিলেন বিক্রমশীলা মহাবিহারের অধ্যক্ষ। তিনি তিব্বতের রাজার অনুরোধে বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও সংস্কারের জন্য তিব্বতে গিয়েছিলেন। নালন্দার মত বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি ভারতে ও ভারতের বাইরে বহুদূর ছড়িয়ে পড়েছিল।

অতীশ দীপঙ্কর

ওদন্তপুর মহাবিহার স্থাপন পাল রাজাদের অন্যতম প্রধান কীর্তি। এই মহাবিহারে বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র, দর্শন ইত্যাদি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ব্যবস্থা ছিল। এখানকার গ্রন্থাগার ছিল অতি বিখ্যাত। যোগ্যতার

পরিচয় দিয়ে এখানে ছাত্ররা প্রবেশলাভ করত। এখানে বিনা বেতনে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। প্রধানতঃ মহাযান বৌদ্ধশাস্ত্রই এখানে আলোচিত হত। **আচার্য শীলরক্ষিত** ছিলেন এই মহাবিহারের অধ্যক্ষ। অতীশ দীপঙ্কর এই মহাবিহারেই শিক্ষালাভ করেছিলেন।

দক্ষিণ ভারত
(SOUTH INDIA)

গুপ্তযুগ পর্যন্ত ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস প্রধানতঃ উত্তর ভারতকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়েছে। গুপ্তোত্তর যুগে দক্ষিণ ভারতের রাজনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে দক্ষিণ ভারতের পশ্চিমদিকে চালুক্য এবং পূর্বদিকে পল্লব রাজবংশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। উভয় রাজবংশের মধ্যে প্রাধান্য লাভের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতাও চলত।

চালুক্য বংশ ঃ কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে চালুক্যগণ ছিলেন গুর্জর জাতির বংশধর। ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রথম পুলকেশী চালুক্যরাজ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রাজধানী ছিল বাতাপী বা বাদামী। তিনি কয়েকটি রাজ্য জয় করে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। প্রথম পুলকেশীর পর যথাক্রমে রাজত্ব করেন কীর্তিবর্মা ও মঙ্গলেশ। চালুক্য বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন **দ্বিতীয় পুলকেশী**। সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে তিনি সিংহাসন লাভ করেন। দক্ষিণ ভারতের পল্লব, চোল, পাণ্ড্য, কেরল প্রভৃতি বহু রাজ্য তিনি জয় করেছিলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি উত্তর ভারতের সম্রাট হর্ষবর্ধনকে পরাজিত করা। হিউয়েন সাঙ্ তাঁর রাজত্বকালে চালুক্য রাজ্য পরিভ্রমণ করেন। তিনি দ্বিতীয় পুলকেশীর শাসনব্যবস্থা ও চালুক্য রাজ্যের আর্থিক সমৃদ্ধির প্রশংসা করেছিলেন। ৬৪২ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় পুলকেশী পল্লব রাজ নরসিংহ বর্মণের দ্বারা পরাজিত ও নিহত হন।

কিছুকাল পরে দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য চালুক্য বংশের গৌরব পুনরুদ্ধার করেন। তিনি আরব অভিযানকারীদের পরাজিত করেছিলেন। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে চালুক্য বংশের পতন ঘটে।

চালুক্য রাজারা ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক। তাঁদের রাজত্বকালে দক্ষিণ ভারতের বহু মন্দির নির্মিত হয়। **লোকেশ্বর শিবমন্দির** এবং **সঙ্গমেশ্বর মন্দির** চালুক্য স্থাপত্য শিল্পের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। ভারতের শিল্পতীর্থ অজন্তা গুহা নির্মাণে চালুক্য রাজাদের অবদান প্রচুর। **হাতী গুহা এবং অজন্তা গুহাগুলোর দেওয়ালচিত্রগুলো** চালুক্য শিল্পকলার অপূর্ব নিদর্শন।

ত্রিমূর্তি (হাতী গুহা)

পল্লব বংশ ঃ পল্লব বংশ দক্ষিণ ভারতের একটি প্রাচীন রাজবংশ। গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের আমলে দক্ষিণ ভারতে পল্লবরাজ বিষ্ণুগোপের উল্লেখ পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষ ভাগ থেকে পল্লবদের ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে জানা যায়। এই সময় সিংহবাহু নামে এক রাজা পল্লব রাজবংশে রাজত্ব করতেন। তিনি দক্ষিণ ভারতের বহু রাজ্য—এমন কি সিংহলও জয় করেন। তাঁর রাজধানী ছিল কাঞ্চী নগরীতে। নবম শতাব্দী পর্যন্ত পল্লব রাজ্য ছিল দক্ষিণ ভারতের প্রধান শক্তি।

সপ্তম শতকের প্রথমভাগে সিংহবাহুর পুত্র মহেন্দ্রবর্মণ সিংহাসন লাভ করেন। তাঁর রাজত্বকাল থেকে দক্ষিণ ভারতে দীর্ঘস্থায়ী পল্লব-চালুক্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূচনা হয়। তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী।

নরসিংহ বর্মণ ছিলেন এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি চালুক্যরাজ

দ্বিতীয় পুলকেশীকে পরাজিত ও নিহত করেন। সুদূর দক্ষিণে পাণ্ড্য রাজ্য ও সিংহলে তিনি আধিপত্য বিস্তার করেন। মহাবলীপুরমের বিখ্যাত মন্দির নরসিংহ বর্মণের শিল্পানুরাগের পরিচয় দেয়। নরসিংহ বর্মণের মৃত্যুর পর পল্লব শক্তির পতন আরম্ভ হয়। নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে চোল আক্রমণে পল্লব রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়।

পল্লবরাজারা ছিলেন শিল্প-স্থাপত্য ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক। রাজধানী কাঞ্চী ছিল দক্ষিণ ভারতের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। হিউয়েন সাঙ্ নরসিংহ বর্মণের রাজত্বকালে কাঞ্চী নগরী পরিভ্রমণ করেছিলেন।

পল্লবরাজাদের অধীনে দাক্ষিণাত্যে ভাস্কর্য, চিত্রকলা ও স্থাপত্য শিল্পের বিশেষ উন্নতি ঘটে। কাঞ্চীর **কৈলাসনাথের মন্দির,**
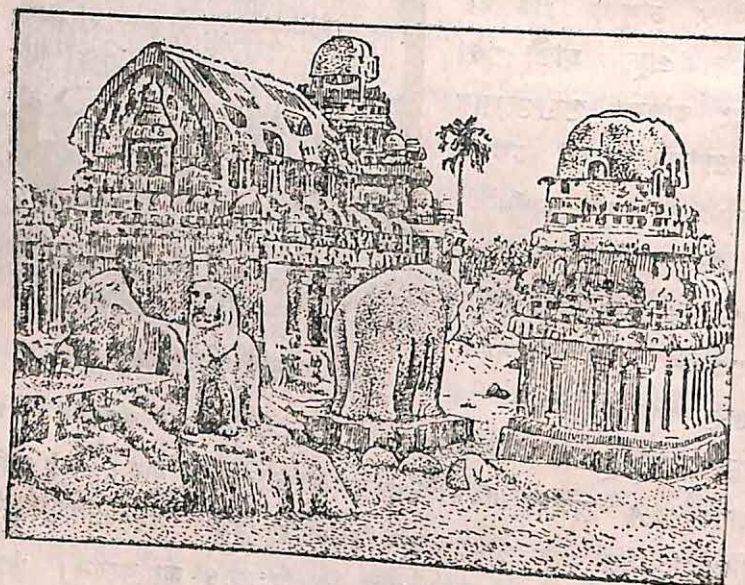
সপ্তরথ মন্দির (মহাবলীপুরম্)

ঐরাবতেশ্বর মন্দির এবং মহাবলীপুরমের **সপ্তরথ মন্দির,** পল্লব শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। পাহাড় কেটে এই সব মন্দিরগুলো তৈরী করা হয়েছিল। এই সব মন্দিরের নির্মাণকৌশল ও গঠন-সৌন্দর্য আজও শিল্পরসিকদের বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। মন্দিরের গায়ে খোদাই করা মূর্তিগুলো ভাস্কর্য-শিল্পের অপরূপ নিদর্শন। পল্লবদের শিল্প ও স্থাপত্যরীতি পরবর্তী যুগে

সমগ্র দক্ষিণ ভারতে শিল্পাদর্শ রূপে পরিগণিত হয়েছে। এমন কি ভারতের বাইরে যবদ্বীপ, কম্বোজ, আনাম ইত্যাদি অঞ্চলে পল্লব শিল্পরীতি অনুসরণ করে মন্দির, মূর্তি ইত্যাদি তৈরী হয়েছিল। ভারতের শিল্পের ইতিহাসে পল্লব যুগ চিরদিন একটি মর্যাদাপূর্ণ স্থান অধিকার করে থাকবে।

চোল রাজবংশ ঃ নৌপ্রাধান্য বিস্তার ঃ সুদূর দক্ষিণে অবস্থিত চোল রাজ্য ভারতের অন্যতম প্রাচীন রাজ্য। বহু প্রাচীনকাল থেকে চোল রাজ্যের সামুদ্রিক বাণিজ্য ও নৌ-প্রাধান্যের কথা জানা যায়। নবম শতাব্দীতে পল্লবদের পতনের পর চোলদের প্রাধান্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন প্রথম পরান্তক। চোল রাজ রাজারাজের সময়ে চোল বংশের গৌরবময় যুগের সূচনা হয়। তাঁর একটি শক্তিশালী বিরাট নৌবহর ছিল। তার সাহায্যে তিনি সিংহলের কিছু অংশ, মালদ্বীপ, লাক্ষাদ্বীপ ইত্যাদি জয় করেন। তিনি শিল্প ও স্থাপত্যের অনুরাগী ছিলেন।

রাজরাজের পুত্র রাজেন্দ্র চোল ছিলেন এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। চোল নৌবাহিনীর শক্তি ও খ্যাতি তখন সর্বোচ্চ শিখরে। গঙ্গাতীর পর্যন্ত সমস্ত উপকূল জয় করে তিনি **গঙ্গইকোণ্ড** (গঙ্গাতীর বিজয়ী) উপাধি গ্রহণ করেন। সমুদ্র অতিক্রম করে তিনি দক্ষিণ ব্রহ্ম, মার্তাবান, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, মালয়, যবদ্বীপ ও সুমাত্রা দ্বীপ জয় করেন। তাঁর আমলে সামুদ্রিক বাণিজ্য অসামান্য উন্নতি লাভ করে। কাবেরী পদ্দিনম্ ছিল চোল রাজ্যের শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য বন্দর। চোল বাণিজ্যতরী ব্রহ্মদেশ ও মালয় দ্বীপপুঞ্জে সর্বদাই যাতায়াত করত। পারস্য উপসাগর ও লোহিত সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলগুলোর সঙ্গেও নৌপথে বাণিজ্য চলত।

চোল রাজাদের নৌশক্তি ও সামুদ্রিক বাণিজ্য দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সমুদ্র অতিক্রম করে তাঁরা দূর দূরান্তরে ভারতীয় প্রভাব ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

অনুশীলনী

১। হুণ কাদের বলা হয়? ভারতে হুণ আক্রমণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখ।

২। হর্ষবর্ধন কে ছিলেন? তাঁর সিংহাসন লাভ ও রাজ্যবিস্তারের কাহিনী বর্ণনা কর।

৩। হিউয়েন সাঙ্ কে ছিলেন? তাঁর ভ্রমণ কাহিনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৪। রাজপুত বলতে কাদের বোঝায়? ভারতের ইতিহাসে রাজপুত যুগ বলতে কোন্ সময়কালকে বোঝায়? বিভিন্ন রাজপুত রাজ্যগুলোর নাম বল।

৫। শশাঙ্কের আমলে বাংলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখ।

৬। পাল ও সেন যুগে বাংলার সমাজ ও দৈনন্দিন জীবন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৭। দক্ষিণ ভারতের চালুক্য রাজবংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখ।

৮। দক্ষিণ ভারতের চালুক্য ও পল্লব আমলের শিল্প ও স্থাপত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখ।

৯। চোল রাজাদের নৌশক্তি বিস্তারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

১০। কম কথায় উত্তর দাও ঃ

(ক) শ্বেত হুণ কাদের বলে?

(খ) হর্ষবর্ধন রচিত নাটকগুলোর নাম কি কি?

(গ) 'গঙ্গইকোণ্ড' উপাধি কে গ্রহণ করেছিলেন?

১১। টীকা লেখ ঃ

(ক) নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় (খ) ত্রিশক্তি সংগ্রাম (গ) বিক্রমশীলা মহাবিহার (ঘ) নরসিংহ বর্মণ।

১২। বন্ধনীর মধ্যস্থিত ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(ক) হুণদের প্রথম বিখ্যাত দলপতির নাম——। (মিহিরকুল / তোরমান / এ্যাটিলা)

(খ) শশাঙ্কের রাজধানী ছিল——। (গৌড় / মালদহ / কর্ণসুবর্ণ)

(গ) পবনদূতের রচয়িতা——। (ধোয়ী / উমাপতি / জয়দেব)

(ঘ) অতীশ দীপঙ্কর ছিলেন——মহাবিহারের অধ্যক্ষ। (নালন্দা / বিক্রমশীলা / তক্ষশিলা)

দ্বাদশ অধ্যায়

ভারতের সঙ্গে বহির্বিশ্বের যোগাযোগ

(India's foreign contacts)

ভারতবর্ষ একদিকে পর্বত ও তিনদিকে সমুদ্র দিয়ে ঘেরা। তা সত্ত্বেও ভারত কখনো পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকেনি। অতি প্রাচীনকাল থেকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ভারতের ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, বিভিন্ন যুগে বহু বিদেশী জাতি ভারতে এসে প্রবেশ করেছে। কিন্তু ভারতের গ্রহণশক্তির ফলে সকলেই ভারতের সংস্কৃতি ও জনসমাজের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। আর্যদের থেকে শুরু করে গ্রীক, শক, হুণ, পাঠান, মোগল সব বিদেশী জাতিই ভারতীয় সংস্কৃতি ধারার সঙ্গে মিশে গিয়েছে। এইভাবে বহু ধারার মিলনে সৃষ্টি হয়েছে এক বিরাট, ব্যাপক ও অভিনব সংস্কৃতি ধারা। এইভাবে ভারত যেমন সকলের কাছ থেকে কিছু না কিছু গ্রহণ করে নিজ সংস্কৃতিকে পুষ্ট করছে, তেমনি উদারভাবে তা বিলিয়ে দিয়েছে বহুজনের মাঝে। ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে ভারতীয় সভ্যতার আলো ছড়িয়ে পড়েছে নানাদিকে। স্থলপথে আফগানিস্তান, পশ্চিম এশিয়া, মধ্য এশিয়া, চীন, তিব্বত ইত্যাদি দেশে এবং জলপথে ব্রহ্মদেশ, সিংহল, শ্যামদেশ, ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ভারতীয় সভ্যতা, ধর্ম শিল্প-সংস্কৃতি বিস্তৃত হয়ে পড়ে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বহু স্থানে ভারতীয় উপনিবেশও স্থাপিত হয়।

মধ্য এশিয়া ঃ মধ্য এশিয়ার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বহু নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। কুষাণ সম্রাটরা এই অঞ্চলে যেমন রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তেমনি কুষাণ যুগে মহাযান বৌদ্ধ ধর্মমত এই অঞ্চলে বিস্তার লাভ করেছিল। কাস্পিয়ান সাগরের তীর থেকে চীনের প্রাচীর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যাযাবর জাতিদের মধ্যে মহাযান বৌদ্ধমত প্রসার লাভ করে। বর্তমান

খোটানের চারদিকে অসংখ্য ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল। কালের প্রভাবে এই উপনিবেশগুলো গোবি মরুভূমির বালুকাতলে লুপ্ত

হয়। বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক স্যার অরেল স্টাইন মধ্য এশিয়ার বহু দুর্গম স্থান খনন করে অসংখ্য বৌদ্ধ স্তূপ ও বিহার, বৌদ্ধ ও হিন্দুদের দেবমূর্তি
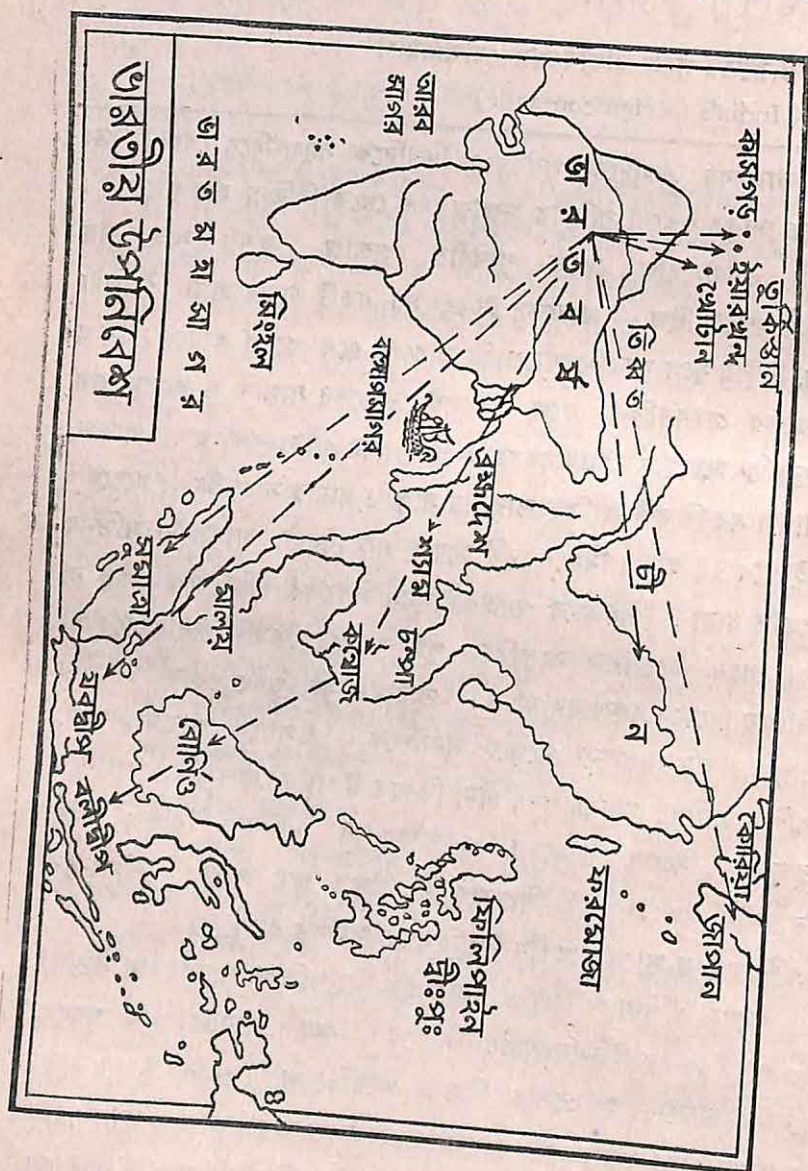
এবং সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় লেখা প্রচুর পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেছেন। খোটানে একটি ভারতীয় রাজবংশ দীর্ঘকাল রাজত্ব করেছিল। চীনদেশীয় পরিব্রাজক ফা-হিয়েন এবং হিউয়েন সাঙ্ উভয়েই খোটানে বৌদ্ধধর্মের প্রতিপত্তির কথা বলে গেছেন। ফা-হিয়েন গোমতী বিহার নামে এক বিরাট বৌদ্ধ মঠের বর্ণনা দিয়েছেন। সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন সাঙ্ যখন মধ্য এশিয়ার পথে ভারতে আসেন ও চীনদেশে ফিরে যান, তখন তিনি মধ্য এশিয়ার বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাধান্য লক্ষ্য করেছিলেন। দেশে ফেরার পথে তিনি খোটানের ভারতীয় রাজা বিজিত সিংহের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন।

মধ্য এশিয়ার পথ ধরেই ভারতীয় মহাযান বৌদ্ধধর্ম চীনদেশে ছড়িয়ে পড়ে। বহু সংখ্যক চীনা ভিক্ষু ও পরিব্রাজক ভারতে এসেছিলেন বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য। তাঁরা বৌদ্ধধর্মগ্রন্থের পুঁথি, বুদ্ধদেবের মূর্তি ইত্যাদি ভক্তিভরে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। ভারতীয় পণ্ডিতদের অনেকে চীনদেশে গিয়েছিলেন গৌতম বুদ্ধের বাণী প্রচার করার জন্য। বৌদ্ধধর্মের বিকাশভূমি ভারতে আজ বৌদ্ধধর্মাবলম্বীর সংখ্যা কম হলেও চীনদেশের কোটি কোটি লোক আজও বৌদ্ধধর্ম মেনে চলে। বৌদ্ধধর্মের বহু মূল্যবান গ্রন্থ ভারতে পাওয়া যায়নি, পাওয়া গেছে চীন দেশে। চীনদেশ থেকেই বৌদ্ধধর্ম কোরিয়া ও জাপানে ছড়িয়ে পড়েছিল।

তিব্বত ঃ হিমালয়ের উত্তরে একটি ছোট দেশ তিব্বত। সপ্তম শতাব্দীতে তিব্বতে রাজত্ব করতেন স্রং-সান-গাম্পো। তিনি ছিলেন হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক। তিব্বতে তিনিই বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেন। খোটানে যে ভারতীয় লিপি প্রচলিত ছিল, তিনি তিব্বতে সেই লিপির প্রচলন করেন। তিব্বতে বহু মঠ-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। তিব্বতে বৌদ্ধ পণ্ডিতরা ভারতের নালন্দা, বিক্রমশীলা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করতে আসতেন। বাংলার পাল রাজারা তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার সম্বন্ধে অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। বাঙ্গালী বৌদ্ধ পণ্ডিত অতিশ দীপঙ্কর তিব্বতরাজের আমন্ত্রণে একাদশ শতাব্দীতে

সেখানে যান। তিনি সেখানে বৌদ্ধ ধর্মের সংস্কার সাধন করেন। আজও তিব্বতীয়রা পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে অতীশ দীপঙ্করকে স্মরণ করেন। বহু বৌদ্ধগ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করা হয়। সেইসব গ্রন্থের মধ্যে তঞ্জুর ও কঞ্জুর নামে দুটি বিখ্যাত সংগ্রহ গ্রন্থ আজও রয়েছে।

সমুদ্রপথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় উপনিবেশ ও সংস্কৃতির বিস্তার ঃ

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে মালয় উপদ্বীপ, সুমাত্রা, জাভা, বলি, বোর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ এবং আনাম, কাম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশগুলো **সুবর্ণভূমি** নামে পরিচিত ছিল। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে বাংলা, কলিঙ্গ ও পূর্ব-উপকূলের বন্দর থেকে ভারতীয় বণিকরা সমুদ্রপথে পালতোলা নৌকোয় সুবর্ণভূমিতে যেত। সেখানে পাওয়া যেত বিভিন্ন ধরনের মশলা ও ধাতুদ্রব্য। ভারতের প্রাচীন গ্রন্থাদিতে সুবর্ণভূমি ঐশ্বর্য নিয়ে বাণিজ্য যাত্রা সম্বন্ধে বহু কাহিনী আছে। ক্রমে সেখানে ভারতীয়দের বসবাস আরম্ভ হয়, গড়ে ওঠে বহু উপনিবেশ খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম শতকের মধ্যে সুবর্ণভূমির বিভিন্ন স্থানে ভারতীয় ঔপনিবেশিক রাজ্য গড়ে ওঠে। ভারতীয় ভাষা, লিপি, ধর্ম, আচার ব্যবহার সবই সেখানে ছড়িয়ে পড়ে। সেখানকার স্থানীয় অধিবাসীরা হিন্দুধর্ম ও হিন্দু আচার-ব্যবহার ধীরে ধীরে গ্রহণ করে, বৌদ্ধধর্মও প্রচারিত হয়।

সম্ভবতঃ প্রথম বা দ্বিতীয় শতকে বর্তমান ইন্দোচীনের কাম্বোডিয়া দেশে প্রথম হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অঞ্চলের প্রাচীন নাম কম্বোজ। ষষ্ঠ শতাব্দীতে কম্বোজের প্রকৃত গৌরবের যুগ শুরু হয়। এক সময়ে কম্বোজ রাজ্য কাম্বোডিয়া, কোচিন, চীন, শ্যাম ব্রহ্মদেশের একাংশ ও মালয় উপদ্বীপ নিয়ে গঠিত ছিল। কম্বোজের রাজারা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সভ্যতার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই রাজ্যটি ন'শো বছর স্থায়ী হয়েছিল।

যশোধরপুর ছিল এই রাজ্যের রাজধানী। এর বর্তমান নাম **আঙ্কোরথম**। নবম শতকে রাজা জয়বর্মণ এই রাজধানী স্থাপন করেন। লোকসংখ্যা, ঐশ্বর্য ও বিশালতায় এর কোন তুলনা ছিল না। যশোধরপুর ছিল তখনকার দিনে পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ নগর। ৩৩০ ফুট বিস্তৃত পরিখা দিয়ে নগরটি সুরক্ষিত ছিল। সুরম্য প্রাসাদশ্রেণী, প্রশস্ত রাজপথ, উদ্যান, সরোবর এবং মন্দিরাদি নগরের শোভা বর্ধন করত। নগরের মাঝখানে ছিল বিখ্যাত বায়ন মন্দির। বিরাট পিরামিডের মত দেখতে এই মন্দিরের মধ্যকার চূড়াটি ছিল ১৫০ ফুট উঁচু। স্তম্ভগুলোতে ধ্যানস্থ শিবের মূর্তি সুন্দরভাবে খোদিত ছিল। কম্বোজের সভ্যতার আর একটি আশ্চর্য নিদর্শন **আঙ্কোরভাটের বিখ্যাত বিষ্ণু মন্দির**। সমস্ত পৃথিবীতে পাথরের তৈরী এতবড় মন্দির আর নেই। দ্বাদশ শতাব্দীতে বিষ্ণুভক্ত রাজা সূর্যবর্মণ এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কয়েকটি ক্রমোচ্চ থাকের মঞ্চের উপর মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত। মন্দির শিখরের উচ্চতা ২১৩ ফুট। মন্দিরে উঠবার পথের পাশে প্রাচীরে হিন্দু দেবদেবীর উপাখ্যান উৎকীর্ণ করা রয়েছে। আঙ্কোরভাট ও আঙ্কোরথমের বায়ন মন্দিরের শিল্পকলা ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।
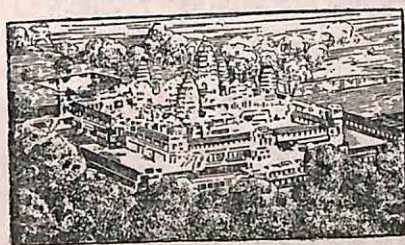
বায়ন মন্দির

আঙ্কোরভাট মন্দির

কম্বোজের অনতিদূরে আর একটি বিখ্যাত হিন্দু রাজ্য ছিল।

এর নাম **চম্পা** (বর্তমান আনাম বা ভিয়েতনাম)। এখানে বহু সমৃদ্ধিশালী নগর এবং হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির ছিল। এখানকার রাজারা বহু দিন ধরে খুব বীরত্বের সঙ্গে প্রতিবেশী কম্বোজ ও চীন সম্রাট কুবলাই খানের আক্রমণ প্রতিরোধ করেন। দীর্ঘ ১৩০০ বছর এই রাজ্যটি স্থায়ী হয়। চম্পা ছিল প্রাচীনকালে সংস্কৃত শিক্ষার এক প্রসিদ্ধ কেন্দ্র।

মালয় উপদ্বীপ এবং পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও প্রভৃতি অঞ্চলে যে সব শক্তিশালী হিন্দুরাজবংশ রাজত্ব করতেন, সুমাত্রার শৈলেন্দ্র রাজবংশ ছিল তাদের মধ্যে সর্বপ্রধান। শৈলেন্দ্র নামটি সম্পূর্ণ ভারতীয়। শ্রীবিজয় ছিল শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের রাজধানী। খ্রীস্টীয় অষ্টম শতকের শেষভাগে সুমাত্রা, যবদ্বীপ বা জাভা, বোর্ণিও, বলিদ্বীপ, মালয় ইত্যাদি স্থানে শৈলেন্দ্র বংশের প্রভুত্ব বিস্তৃত হয়। চম্পা ও কম্বোজ রাজ্যের সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধ ছিল শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের বৈশিষ্ট্য। ভারত ও চীনের সঙ্গে শৈলেন্দ্র বংশের রাজারা দূত বিনিময় করেছিলেন। তাঁদের নৌবহর ছিল খুবই শক্তিশালী। যে সব আরব বণিক শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে যেতেন, তাঁরা এই সাম্রাজ্যের শক্তি ও ঐশ্বর্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। নবম শতাব্দীতে একজন আরব বণিক লিখেছেন, শৈলেন্দ্র রাজ্যের দৈনিক আয় ছিল দুশো মণ সোনা এবং মহারাজা প্রতিদিন একটি করে সোনার ইট জলদেবতাকে উৎসর্গ করতেন। একাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতের চোল সম্রাট রাজেন্দ্রচোলের আক্রমণে শৈলেন্দ্র বংশের শক্তি ক্ষয় হয় এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এই বংশের পতন ঘটে।

শৈলেন্দ্র বংশের ধর্ম ও সংস্কৃতি ছিল সম্পূর্ণ ভারতীয়। এই বংশের রাজারা মহাযান বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শৈলেন্দ্ররাজ বালপুত্রদেব ভারতের নালন্দাতে এক বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করেন। তিনি বাংলার পালরাজ দেবপালের কাছে এক দূত পাঠান এবং তাঁকে ঐ বিহারের জন্য পাঁচটি গ্রাম দান করতে অনুরোধ করেন। দেবপাল সে অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন। বাঙ্গালী বৌদ্ধ পণ্ডিত কুমার ঘোষ শৈলেন্দ্র

রাজাদের ধর্মগুরু ছিলেন। তাঁর আদেশে মালয়ে তারাদেবীর বিখ্যাত মন্দির নির্মিত হয়েছিল।

শৈলেন্দ্র বংশের রাজারা ছিলেন স্থাপত্য ও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক। **বরোবুদুরের বিশ্ব বিখ্যাত বৌদ্ধ মন্দির** শৈলেন্দ্র রাজাদের প্রধান কীর্তি। অষ্টম শতাব্দীতে জাভায় এই মন্দিরটি নির্মিত হয়। একটি ছোট পাহাড়ের ওপর স্থাপিত এই বিরাট মন্দিরটি পর পর নয়টি স্তরে নির্মিত। একেবারে ওপরে ঘণ্টার আকারে তৈরী এক বিরাট স্তূপ। মন্দিরের প্রধান বিগ্রহ ছিল বুদ্ধমূর্তি। মন্দিরের গায়ে
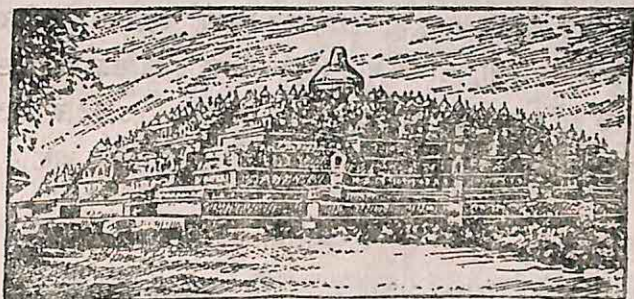
বরোবুদুরের মন্দির

জাতকের কাহিনীগুলো খোদাই করা রয়েছে। বরোবুদুরের মন্দিরকে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য বলা হয়ে থাকে। শৈলেন্দ্র বংশের পতনের পর হিন্দুরা বরোবুদুরের মন্দির গাত্রে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের মূর্তি খোদাই করেছিল। রামায়ণ, মহাভারতের, অসংখ্য কাহিনীও সেখানে রূপায়িত হয়েছে। বরোবুদুরের মন্দির প্রাচীন স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

জাভা বা যবদ্বীপ ছিল হিন্দু সভ্যতার বড় কেন্দ্র। খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে শুরু করে পনেরো শো বছর পর্যন্ত বিভিন্ন হিন্দু রাজবংশ এখানে রাজত্ব করেছে। অষ্টম শতাব্দীতে যবদ্বীপ শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের অধীন হলেও, নবম শতাব্দীতে পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিজয় নামে একজন রাজা এখানে একটি নতুন রাজবংশ

স্থপন করেন। তিক্তবিল্ব (অধুনা মাজাপহিত) ছিল এই রাজ্যের রাজধানী। ষোড়শ শতাব্দীতে মুসলমান বিজয়ের ফলে এই হিন্দু রাজ্যের অবসান ঘটে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ভারতীয় নামধারী হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজাগণ প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে রাজত্ব করেছেন। ভারতীয় ধর্ম, ভারতীয় সামাজিক নিয়ম-কানুন, আচার-ব্যবহার, ভারতীয় সাহিত্য ও রামায়ণ-মহাভারত নামে মহাকাব্যদ্বয় এবং ভারতীয় শিল্পরীতি এশিয়ার বুকে এক বৃহত্তর ভারতীয় সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল। বহু অঞ্চলে যখন আদিম অধিবাসীদের মধ্যে সভ্যতার প্রসার হয়নি তখন ভারতীয়গণ সেখানে উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রসারের অগ্রণী হয়েছে। ইতিহাসের বহু পরিবর্তনের মধ্যে, আজও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন জাতিগুলোর জীবনে ভারতীয় সংস্কৃতির ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে আছে। ভারতীয় সংস্কৃতির এই জয়যাত্রার কথা, ভারত ইতিহাসের একটি গৌরবজনক অধ্যায়।

অনুশীলনী

১। মধ্য এশিয়ার সঙ্গে প্রাচীনকালে ভারতের কিরূপ যোগাযোগ ছিল?

২। তিব্বতের সঙ্গে প্রাচীন ভারতের যোগাযোগ বর্ণনা কর।

৩। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় প্রভাব বিস্তারের সংক্ষিপ্ত কাহিনী লেখ।

৪। শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজত্বকালের স্থাপত্য ও চিত্রকলার নিদর্শনের বিবরণ সংক্ষেপে লেখ।

৫। **কম কথায় উত্তর দাও:**

(ক) তিব্বতে ভারতীয় লিপির প্রচলন কে করেন?

(খ) কোন্ প্রত্নতাত্ত্বিক মধ্য এশিয়ায় বৌদ্ধ স্তূপগুলো আবিষ্কার করেন?

(গ) কোন্ অঞ্চলকে সুবর্ণভূমি বলা হত?

(ঘ) পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য কাকে বলা হয়?

৬। **টীকা লেখ:**

তঞ্জুর ও মঞ্জুর, আঙ্কোরথম, আঙ্কোরভাট, অতীশ দীপঙ্কর, শৈলেন্দ্র রাজবংশ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দিল্লীর সুলতানী যুগ (১২০৬ খ্রীঃ থেকে ১৫২৬ খ্রী ঃ)
The Sultans of Delhi (1206 to 1526 A. D.)

তুর্ক-আফগানদের ভারতে আগমন ঃ খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে হজরত মহম্মদ আরবদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন। মহম্মদের মৃত্যুর পর মুসলমানগণ নবীন ধর্ম প্রেরণায় আরবরা খলিফাদের নেতৃত্বে পারস্য, পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকা জয় করে। অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকে আরবরা সিন্ধু দেশ জয় করে। কয়েক শতাব্দী সিন্ধুদেশ আরবদের অধিকারে থাকে। কিন্তু আরবরা ভারতে মুসলিম রাজ্যবিস্তারে সফল হয়নি। সফল হয়েছিল পরবর্তীকালে তুর্কী আক্রমণকারীরা।

একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আফগানিস্তানের অন্তর্গত গজনী রাজ্যের তুর্কী সুলতান মামুদ ব্যাপকভাবে ভারত আক্রমণ শুরু করেন। মামুদের পিতা সবুক্তিগীন ভারত আক্রমণের সূচনা করেছিলেন। ১০০১ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১০২৬ খ্রীস্টাব্দে মধ্যে মধ্যে ১৭ বার সুলতান মামুদ ভারত আক্রমণ করেন। তাঁকে প্রবলভাবে বাধা দিয়েছিলেন পাঞ্জাবের শাহী বংশের রাজা জয়পাল ও তাঁর পুত্র আনন্দপাল। কিন্তু তাঁরা মামুদকে প্রতিহত করতে পারেন নি। মামুদ তাঁর বিভিন্ন অভিযানে বহু নগর, মঠ, মন্দির ইত্যাদি বিধ্বস্ত করেন এবং লুণ্ঠন করেন। কিন্তু ভারতে স্থায়ী সাম্রাজ্যে স্থাপনের ইচ্ছা তাঁর ছিল না। বহুবার আক্রমণ করলেও তিনি শুধুমাত্র পাঞ্জাব তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করেছিলেন। ভারতের অপার ঐশ্বর্য তাঁকে প্রলুব্ধ করেছিল, তাই তিনি বারবার ভারত অভিযান করে প্রচুর ধনরত্ন লুণ্ঠন করে গজনীতে ফিরে যান।

সুলতান মামুদের আক্রমণের বহুকাল পরে মুহম্মদ ঘুরী দ্বাদশ শতকের শেষার্ধে উত্তর ভারতে মুসলিম রাজ্য স্থাপনে সক্ষম হয়েছিলেন।

তিনি ছিলেন আফগানিস্তানের ঘুর রাজ্যের শাসকের ভ্রাতা। এই সময় উত্তর ভারত কতকগুলো ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়েছিল। এই রাজ্যগুলোর মধ্যে কোন ঐক্য ছিল না। রাজপুত রাজাদের এই অনৈক্যের ফলে মুহম্মদ ঘুরীর পক্ষে ভারত জয় সহজ ও সম্ভব হয়েছিল। মামুদের মত তিনিও কয়েকবার ভারত আক্রমণ করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ভারতে মুসলমান অধিকার স্থাপন করা। প্রথমদিকে তিনি ভারত আক্রমণ করে ব্যর্থ হন। ১১৯১ খ্রীস্টাব্দের তরাইনের যুদ্ধে পৃথ্বিরাজ তাঁকে পরাজিত করেন। কিন্তু এই পরাজয়ে হতাশ না হয়ে তিনি পরের বছর আবার অভিযান করেন এবং তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথ্বিরাজ পরাজিত ও নিহত করেন। মুহম্মদ ঘুরী তাঁর একজন সুযোগ্য ও বিশ্বাসী সহকারী কুতুবউদ্দিন আইবেককে ভারতের বিজিত অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এই ভাবে দিল্লীকে কেন্দ্র করে ভারতে একটি মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় ১২০৬ খ্রীস্টাব্দে অপুত্রক অবস্থায় মুহম্মদ ঘুরীর মৃত্যু হলে **কুতুবউদ্দিন স্বাধীনভাবে দিল্লীতে এক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন**ঃ এই বংশ সাধারণভাবে **দাসবংশ** নামে পরিচিত। এই সময় থেকে ভারতে সুলতানী শাসনের সূত্রপাত হয়। ১২০৬ থেকে ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে পাঁচটি সুলতানী বংশ ভারতে রাজত্ব করে।

রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনঃ কুতুবউদ্দিন ছিলেন প্রথম জীবনে ক্রীতদাস। তাঁর পরবর্তী কয়েক জন সুলতানও ছিলেন ক্রীতদাস। তাই তাঁর প্রতিষ্ঠিত সুলতান বংশকে দাস বংশ বলা হয়। কুতুবউদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর ক্রীতদাস ও জামাতা ইলতুৎমিস সুলতান হন। তিনি খুব যোগ্য সুলতান ছিলেন। বিন্ধ্য পর্বতের উত্তরে প্রায় সমস্ত অঞ্চল তিনি জয় করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে মধ্য এশিয়ার বিখ্যাত মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খান ভারত সীমান্তে এসে পৌঁছেছিলেন। কিন্তু ইলতুৎমিস কৌশলে মোগল আক্রমণের সম্ভাবনা প্রতিহত করেন। ইলতুৎমিসের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে যোগ্যতম ছিলেন তাঁর কন্যা রাজিয়া। তিনি সাড়ে তিন বছর

যোগ্যতার সঙ্গে রাজত্ব করেন। দাস বংশের সর্বশেষ শক্তিশালী সুলতান ছিলেন গিয়াসুদ্দিন বলবন। তিনি প্রথম জীবনে ইলতুৎ-

মিসের ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও কঠোর ছিলেন। নির্মমভাবে বিদ্রোহ ও অরাজকতা দমন করে তিনি দেশে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সতর্কতার জন্য মোঙ্গলরা সুলতানী সাম্রাজ্যের কোন ক্ষতি করতে পারেন নি।

বলবনের পর দাস বংশের পতন হয়। জালালুদ্দিন খলজী নামে

এক বৃদ্ধ সেনাপতি খলজী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তার ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা **আলাউদ্দিন খলজী** ছিলেন দিল্লীর শ্রেষ্ঠ সুলতান।

আলাউদ্দিন খলজী

তিনি ছিলেন একাধারে সুনিপুণ যোদ্ধা, সাম্রাজ্য বিজেতা এবং বিচক্ষণ শাসক। যুদ্ধের পর যুদ্ধ জয় করে তিনি সারা ভারত জুড়ে বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। এত বড় সাম্রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার সুষ্ঠুব্যবস্থা তিনি করেছিলেন। বাজারের জিনিসপত্রের দাম তিনি নির্দিষ্ট করে দেন। সরকারী শস্য ভাণ্ডারে শস্য মজুত থাকত। কোন ব্যক্তির পক্ষে শস্য মজুত রাখা নিষিদ্ধ ছিল। তিনি অল্প বেতনে একটি বিরাট সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। প্রধানতঃ তাদের সুবিধের জন্যই মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তিনি চালু করেন। এতে অবশ্য কৃষক ও কারিগরদের খুবই ক্ষতি হয়। অসামান্য প্রতিভার অধিকারী হলেও আলাউদ্দিন ছিলেন স্বেচ্ছাচারী, নির্মম ও নৃশংস। তার মৃত্যুর অল্পকাল পরে খলজী বংশের পতন হয়।

এরপর গিয়াসুদ্দিন তুগলক নামে এক সেনাপতি তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তার পুত্র **মুহম্মদ বিন তুঘলক** ছিলেন দিল্লীর শ্রেষ্ঠ সুলতানদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। কিন্তু রাজ্যশাসন বিষয়ে তাঁর বাস্তব বুদ্ধির অভাব ছিল। ধৈর্যহীনতা ছিল তাঁর চরিত্রের একটি বড় ত্রুটি। রাজধানী স্থানান্তর, তামার নোট প্রচলন, দিগ্বিজয়ের পরিকল্পনা ইত্যাদি বিরাট বিরাট পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন। কিন্তু বাস্তব বুদ্ধির অভাবে কার্যকর করতে পারেন নি। রাজ্যশাসন ব্যাপারে তাঁর ব্যর্থতা সুলতানী সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে যায়। সাম্রাজ্যের

চতুর্দিকে বিদ্রোহ দেখা যায়। মুহম্মদ তুঘলকের মৃত্যুর পর তাঁর খুড়তুতো ভাই ফিরোজ শাহ সুলতান হন। তিনি ছিলেন শান্তিপ্রিয়, বিনয়ী এবং প্রজা হিতৈষী। কিন্তু ধর্ম বিষয়ে তিনি অনুদার ছিলেন। তিনি বহু শহর, প্রাসাদ, মসজিদ চিকিৎসালয় ইত্যাদি নির্মাণ করিয়েছিলেন। তাঁর বিচার সংস্কার ও বাণিজ্য নীতি ছিল প্রশংসনীয়। তাঁর মৃত্যুর পর সুলতানী সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে এবং বাংলা বিহার, জৌনপুর, কাশ্মীর, মালব, গুজরাট, বাহ্‌মনী, বিজয়নগর ইত্যাদি বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্যের উৎপত্তি হয়। এই অনৈক্যের সুযোগে মধ্য এশিয়ার তুর্কী নেতা তৈমুরলঙ ১৩৯৮ খ্রীস্টাব্দের দিল্লী আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন।

মুহম্মদ বিন তুঘলক

তুঘলক বংশের পতনের পর আরও দুটি রাজবংশ দিল্লীতে রাজত্ব করেছিল। এই দুটি বংশ হল সৈয়দ বংশ ও লোদী বংশ। এদের রাজ্যের আয়তন ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দে লোদী বংশের শেষ সুলতান ইব্রাহিম লোদী, কাবুলের অধিপতি বাবর কর্তৃক পানিপথের প্রথম যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীতে সুলতানী শাসনের অবসান ঘটে। শুরু হয় ভারতে মুঘল শাসন।

সুলতানী আমলে ভারতের **সামাজিক ও অর্থনৈতিক** জীবনে নতুন বৈশিষ্ট্যের সূচনা হয়। ভারতীয় সমাজ তখন দুইভাগে বিভক্ত ছিল বিজেতা মুসলমান ও বিজিত হিন্দু। মুসলমান সমাজ গঠিত ছিল বিদেশী তুর্কী, আফগান ও ভারতীয় ধর্মান্তরিতদের নিয়ে। মুসলমান আক্রমণকারীদের আগে যেসব বিদেশী জাতি ভারতে এসেছিল তারা কালক্রমে হিন্দু সমাজে মিশে গিয়েছিল; কিন্তু মুসলমানরা তাদের পৃথক ধর্ম সংস্কৃতি বজায় রেখেছিল। তখনকার দিনে সমাজ ছিল সামন্ততান্ত্রিক। সুলতান ও সুলতান-পরিবার ছিল

সমাজের শীর্ষে। তারপর ছিল অভিজাত শ্রেণী—আমীর, উচ্চ রাজ-কর্মচারী প্রভৃতি। এই শ্রেণী ছিল খুবই শক্তিশালী। সমাজ জীবনে উলেমা, মোল্লা প্রভৃতির প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল অসীম। সমাজের সর্ব নিম্নস্তরে ছিল আম বা জনসাধারণ। মুসলমানগণ প্রধানতঃ সিয়া ও সুন্নী—এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। সমাজে দাসপ্রথা সুপ্রচলিত ছিল সুলতানরা প্রায় সকলেই ছিলেন বিলাসী ও আড়ম্বর-প্রিয়। মুসলমান সমাজে কঠোর অবরোধ প্রথা প্রচলিত ছিল।

সুলতানী আমলে হিন্দুরা ছিলেন শাসিত শ্রেণী। পরাজিত, পৌত্তলিক হিন্দুদের প্রতি বিজয়ী মুসলমান শ্রেণীর মনোভাব ছিল অনুদার। জোর করে হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করা হত। ফলে হিন্দু সমাজে রক্ষণশীলতা বেড়ে যায়। হিন্দুরা মুসলমান শাসকদের কাছে 'জিম্মি' বলে পরিচিত ছিল। তাদের 'জিজিয়া' নামে ধর্মীয় কর দিতে বাধ্য করা হত। ইসলামের প্রভাব যাতে হিন্দু সমাজকে দুর্বল করতে না পারে, সেইজন্য হিন্দুদের মধ্যে রক্ষণশীলতা বেড়ে যায়। এই সময় হিন্দু সমাজে জাতিভেদ, সতীদাহ ও অবরোধ প্রথা প্রচলিত ছিল।

সুলতানী যুগে অর্থ নৈতিক দিক থেকে ভারত ছিল সমৃদ্ধিশালী। কৃষি ছিল অধিকাংশ ভারতবাসীর বৃত্তি। রেশম ও সূতীবস্ত্র বয়ন এ যুগের প্রধান শিল্প। আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রভুত বিকাশ হয়েছিল। পশ্চিম এশিয়া, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও চীনের সঙ্গে বাণিজ্য চলত। বিলাসদ্রব্য, ঘোড়া ইত্যাদি আমদানী হত এবং খাদ্যশস্য, নীল, রেশম, সূতীবস্ত্র ইত্যাদি রপ্তানী হত। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ছিল সহজ ও সরল। হিন্দুদের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ শস্য কর দিতে হত। জিজিয়া কর, তীর্থকর ইত্যাদিও দিতে হত। আলাউদ্দিন খলজী দ্রব্যমূল্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে পরিব্রাজক ইবন বতুতা লিখেছেন, বাংলাদেশে টাকায় আট মন চাল পাওয়া যেত। কিন্তু সামন্তপ্রথা প্রচলিত থাকায় সাধারণ মানুষের অর্থ নৈতিক অবস্থা ছিল শোচনীয়। সুলতান, আমীর-ওমরাহ, জমিদার জায়গীরদাররা ছিলেন প্রচুর সম্পদের অধিকারী। তারা ঐশ্বর্য

ও বিলাসে দিন যাপন করতেন। বলবনের সভাকবি আমীর খসরু বলেছিলেন, 'রাজার মুকুটের প্রত্যেকটি মুক্তো ছিল দরিদ্রের চোখের এক এক ফোঁটা জল।' দেশে মাঝে মাঝে দুর্ভিক্ষের কথাও জানা যায়।

হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের পারস্পরিক প্রভাবঃ সুলতানী আমলের প্রথম দিকে বিজয়ী মুসলমান অভিযানকারী এবং বিজিত হিন্দু প্রজাদের মধ্যে কিছু বিদ্বেষভাব ছিল। কিন্তু দীর্ঘদিন পাশাপাশি থাকার ফলে কালক্রমে এই বিদ্বেষভাব দূর হয়। হিন্দু-মুসলমান একে অপরকে প্রভাবিত করতে থাকে। প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতি ধারার সঙ্গে নবাগত মুসলমান সংস্কৃতি ধারার এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটে। দুটি উন্নত এবং ভিন্নধর্মী সভ্যতার এবং ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই এই সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। দুটি ভিন্নধর্মী সভ্যতার এরূপ সংমিশ্রণ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

কুতুবমিনার

যে সব হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতেন, তাদের পক্ষে চিরাচরিত আচার-ব্যবহার সম্পূর্ণ ত্যাগ করা সম্ভব হত না; আবার মুসলমান সুলতান বা আমীর ওমরাহরা হিন্দু নারী বিবাহ করে হিন্দু ভাবধারায় প্রভাবিত হতেন। হিন্দু সাধু সন্ত ও মুসলমান পীর-ফকিরগণ উভয় সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা লাভ করতেন। হিন্দু ও মুসলমান কর্তৃক সত্যপীরের পূজো এই সমন্বয়ের নিদর্শনরূপে উল্লেখ করা যেতে পারে। দিল্লীর সুলতানরা ছিলেন শিল্প স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষক। হিন্দু-মুসলমান স্থাপত্য রীতির সংমিশ্রণে এ যুগে এক নতুন স্থাপত্য রীতি গড়ে ওঠে। দিল্লীর

কুতুবমিনার, বিজাপুরের গোলগম্বুজ, দৌলতাবাদের চাঁদ মিনার,
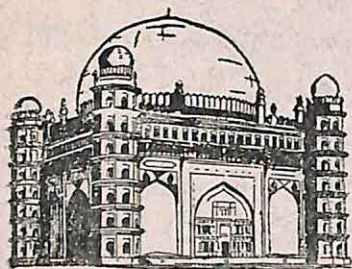
গোলগম্বুজ
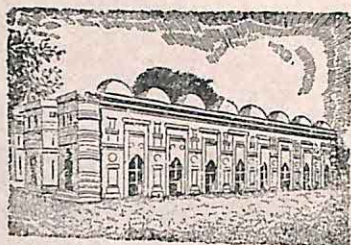
সোনা মসজিদ

পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ, গৌড়ের সোনা মসজিদ ইত্যাদি এ যুগের স্থাপত্যশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন।

এ যুগের প্রাদেশিক শাসনকর্তারা স্থানীয় ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করায় বাংলা, হিন্দী, উর্দু, মারাঠী প্রভৃতি ভাষাগুলির খুবই উন্নতি হয়। গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহ ও নসরত শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় রামায়ণ মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি সংস্কৃত মহাকাব্য ও ধর্মগ্রন্থগুলো বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হয়। এইসময় হিন্দী, আরবী ও ফারসী ভাষার মিশ্রণে উর্দু ভাষার উন্নতি হয়। উর্দু হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই ভাষা হয়ে ওঠে। এযুগের শ্রেষ্ঠ কবি ও লেখক ছিলেন আমীর খসরু। তিনি ছিলেন উর্দু সাহিত্যের আদি কবি।

সুলতানী অমলে কয়েকজন বিখ্যাত ধর্মপ্রচারকের আবির্ভাব ঘটেছিল যারা হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের প্রচার করেন। এই উদার ধর্মনীতি **ভক্তিবাদ** নামে পরিচিত। ভক্তিবাদের মূলকথা—যে নামেই ডাকা হ'ক না কেন ঈশ্বর এবং আল্লা এক, ভক্তি বা প্রেমের মাধ্যমেই তাঁকে লাভ করা যায়, জীবমাত্রেই ভগবানের সন্তান এবং জাতিভেদ কোন ধর্মের অঙ্গ নয়। এই ধর্মাচার্য-দের বাণী হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই গ্রহণযোগ্য হয়েছিল। **শ্রীচৈতন্য, নানক এবং কবীর** ছিলেন ভক্তিধর্ম প্রচারকদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীচৈতন্য ঃ ১৪৮৫ খ্রীস্টাব্দে নবদ্বীপে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে শ্রীচৈতন্যের জন্ম হয়। তিনি ছিলেন বৈষ্ণব ধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রচারক। তাঁর মতে ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তিই মুক্তির একমাত্র উপায়। তিনি জাতিভেদ মানতেন না। মুসলমানরাও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর সাম্যবাদ ও মিলনমন্ত্র বাংলার ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

শ্রীচৈতন্য

নানক ঃ ১৪৬৯ খ্রীস্টাব্দে লাহোরের কাছে তালবন্দী গ্রামে নানক জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জাতিভেদ মানতেন না। হিন্দু-মুসলমান ধর্ম সমন্বয় ছিল তাঁর জীবনের-ব্রত। উভয় সম্প্রদায়ের লোক তাঁর শিষ্যত্ব

নানক

কবীর

গ্রহণ করেছিল। তিনি ছিলেন শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা।

কবীর ঃ কবীর আবির্ভূত হয়েছিলেন পঞ্চদশ শতাব্দীতে। তিনি ছিলেন জোলা জাতীয় মুসলমান সাধক। তিনি বলতেন সকল ধর্মই

এক। হিন্দু ও মুসলমান একই মাটির দুটি পাত্র; আল্লা ও রাম দুটি ভিন্ন নাম মাত্র। হিন্দু-মুসলমান কোন ধর্মেরই প্রচলিত আচার-ব্যবহার তিনি মানতেন না। তাঁর মতে মনের বিশুদ্ধি সাধনই ধর্মের প্রধান কথা।

ইলিয়াস শাহী ও হুসেন শাহী আমলে বাংলাদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থা ঃ সুলতানী আমলের প্রথমদিকে বাংলাদেশ দিল্লীর সুলতানদের অধীন হলেও পরবর্তীকালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল। সুলতানী যুগে পরপর দুটি স্বাধীন সুলতান বংশ বাংলাদেশে রাজত্ব করে—ইলিয়াস শাহী ও হুসেন শাহী বংশ। সুশাসন ও ধর্মনৈতিক উদারতার জন্য এই দুই বংশের সুলতানরা বিখ্যাত ছিলেন। বাংলায় সুলতানী শাসন স্থায়ী হয়েছিল প্রায় তিনশো বছর। এত দীর্ঘদিন একত্রে বসবাসের ফলে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়ে ওঠে। সাধারণ লোকের আচার নিয়ম, বেশভূষায় মুসলমানী প্রথার প্রভাব পড়ে। মুসলমানরাও হিন্দু সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হন। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কও মাঝে মাঝে প্রতিষ্ঠিত হত। সরকারী কাজে ও দলিল পত্রে ফরাসী ভাষা ব্যবহার করা হত। হিন্দুরা পীর-ফকিরদের শ্রদ্ধা করতেন। মুসলমানরাও হিন্দুদের পূজা-পার্বণে যোগ দিতেন। উভয় ধর্ম বিশ্বাসের সমন্বয়ে সত্যপীর, ওলাবিবি ইত্যাদি পূজার প্রচলন হয়।

সুলতানী আমল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এক গৌরবময় যুগ। ইলিয়াস শাহী আমলে শ্রীকৃষ্ণ বিজয় ও মনসামঙ্গল রচিত হয়। বাংলা-ভাষায় মহাভারত অনুবাদ করা হয়। হুসেন শাহী আমলে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের ফলে বাংলা সাহিত্যে নবযুগের সূচনা হয়। লৌকিক ভাষায় সাহিত্য রচিত হতে থাকে। এই সময় সুলতানদের উৎসাহে বহু গ্রন্থ বাংলা ও ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করা হয়। বাংলা রামায়ণ রচয়িতা কৃত্তিবাস সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। রঘুনন্দন, শ্রীকর নন্দী, বিজয়গুপ্ত, মালাধর বসু, কবীন্দ্রপরমেশ্বর, চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবি ও সাহিত্যিক এ যুগের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

এই সময় নবদ্বীপ ছিল একটি বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র। এখানে

বহু সংস্কৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা টোল ছিল। বহু দূর থেকে ছাত্ররা এখানে পড়তে আসত। নব্য ন্যায় দর্শন চর্চার জন্য নবদ্বীপ বিখ্যাত ছিল।

বাংলার সুলতানরা ছিলেন শিল্পানুরাগী। ইলিয়াসশাহী আমলে পাণ্ডুয়ায় আদিনা মসজিদ নির্মিত হয়। হুসেন শাহ ও তাঁর পুত্র নসরৎ শাহ যথাক্রমে ছোট সোনা মসজিদ এবং বড় সোনা মসজিদ ও কদমরসুল মসজিদ নির্মাণ করান। এই মসজিদগুলো সুলতানী আমলের স্থাপত্যশিল্পের উৎকর্ষের নিদর্শন।

সুলতানী আমলে বাংলার জীবন ছিল গ্রামকেন্দ্রিক। কৃষি ও ব্যবসা বাণিজ্য ছিল অধিকাংশ লোকের উপজীবিকা। খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য ছিল। পর্যটক ইবন বতুতার মতে, তৎকালীন বাংলাদেশে জিনিসপত্রের দাম সবচেয়ে সস্তা ছিল। ইলিয়াস শাহী আমলে চীনা-পণ্ডিত **মা-হুয়ান** বাংলায় এসেছিলেন। তাঁর বিবরণী থেকে তখনকার দিনের অর্থ নৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে বহু তথ্য জানা যায়। ব্যবসা বাণিজ্য খুবই উন্নতি লাভ করেছিল। বাংলাদেশে সমুদ্রগামী জাহাজ তৈরী হত। বাংলার শিল্পদ্রব্যের মধ্যে বিখ্যাত ছিল রেশম ও সূতীবস্ত্র, ইস্পাতের ছুরি কাঁচি, অলঙ্কার, জরীর টুপি ইত্যাদি।

সুলতানী আমলে শাসন ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ সুলতানী আমল ছিল স্বৈরতন্ত্রের যুগ। সুলতান ছিলেন একাধারে সর্বোচ্চ শাসন কর্তা, সর্বোচ্চ বিচারক, আইন প্রণেতা ও প্রধান সেনাপতি। সুলতানদের ক্ষমতার উৎস ছিল সামরিক শক্তি। সুলতান পদ বংশানুক্রমিক হলেও, উত্তরাধিকারের নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। কোন কোন ক্ষেত্রে রাজ্যের অভিজাত ব্যক্তিগণ সুলতান নির্বাচন করতেন। রাষ্ট্র ছিল ধর্মাশ্রয়ী। দৈনন্দিন শাসন বিষয়ে মুসলমান ধর্মজ্ঞানীদের প্রভাব খুব বেশী ছিল। তবে আলাউদ্দিন, মহম্মদ তুঘলক ইত্যাদি সুলতানগণ মোল্লা-উলেমাদের উপেক্ষা করে চলতেন।

তখন ছিল সামন্ত সমাজের যুগ। মন্ত্রী, সেনাপতি, প্রাদেশিক শাসনকর্তা ইত্যাদি অভিজাত সম্প্রদায় থেকে নিযুক্ত হতেন। প্রধান মন্ত্রীকে বলা হত **ওয়াজীর**। শাসনের সুবিধার জন্য বহু সরকারী

বিভাগ ছিল। রাজস্ব বিভাগের অধিকাংশ কর্মচারী ছিলেন হিন্দু। দণ্ডবিধি ছিল কঠোর।

ভূমি রাজস্ব ছিল আয়ের প্রধান উৎস। এছাড়া মুসলমান প্রজাদের কাছ থেকে জাকৎ বা ধর্মকর এবং হিন্দুদের কাছ থেকে জিজিয়া কর আদায় করা হত। হিন্দু জমিদারদের কাছ থেকে ভূমিকর, যুদ্ধে লুণ্ঠিত সামগ্রীর এক-পঞ্চমাংশ, গোচারণ কর, জলকর ইত্যাদি থেকেও সুলতানদের আয় হত। বেগার-শ্রম প্রচলিত ছিল।

সুলতানরা বিশাল সৈন্যবাহিনী পোষণ করতেন। সেনাবাহিনী গঠিত হত পদাতিক, অশ্বারোহী ও রণহস্তীদের নিয়ে। এর মধ্যে অশ্বারোহী বাহিনী ছিল প্রধান। সুলতান আলাউদ্দিন খলজী প্রথম স্থায়ী সেনাবাহিনী গঠন করেন।

শাসনের সুবিধার জন্য সুলতানী সাম্রাজ্য কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্তারা সুলতান কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। প্রদেশের উদ্বৃত্ত রাজস্ব কেন্দ্রীয় রাজকোষে জমা দিতে হত। সুলতানরা দুর্বল হয়ে পড়লে প্রাদেশিক শাসকরা স্বাধীনতা ঘোষণা করতেন।

সুলতানী যুগে শাসন ব্যবস্থা ছিল সামরিক ও সামন্ততান্ত্রিক। সুলতানগণ ছিলেন স্বৈরাচারী, জনসাধারণের শুভেচ্ছা ও সমর্থনের ওপর রাষ্ট্র গড়ে ওঠে নি। কাজেই সুলতানদের ব্যক্তিগত দক্ষতা ও সামরিক শক্তি হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে এই ধরনের রাষ্ট্রের পতন ছিল অবশ্যম্ভাবী।

অনুশীলনী

১। সুলতান মামুদ ও মহম্মদ ঘোরীর ভারত অভিযান কাহিনী লেখ।

২। আলাউদ্দিন খলজী ও মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকাল বর্ণনা কর।

৩। সুলতানী আমলের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থার পরিচয় দাও।

৪। ইলিয়াস শাহী ও হুসেন শাহী আমলে বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল?

৫। সুলতানী আমলের শাসন ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৬। **টীকা লেখ :**

দাস বংশ, ভক্তিবাদ, শ্রীচৈতন্য, নানক, কবীর, মা-হুয়ান, ওয়াজীর।

চতুর্দশ অধ্যায়

মধ্যযুগের শেষভাগে

(Towards the end of the Medieval era (14th & 15th centuries)

কনস্ট্যান্টিনোপলের পতন এবং রেনেসাঁসে তার প্রভাব ঃ

খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে (৪৭৬ খ্রীঃ) বর্তমান জার্মান উপজাতিদের আক্রমণে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল। পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতনকেই ইওরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগের সূচনা বলে ধরে নেওয়া হয়। বিশাল রোম সাম্রাজ্য বিভক্ত ছিল দুটি অংশে—পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য ও পূর্ব রোম সাম্রাজ্য বা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য টিঁকে ছিল পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত।

বর্বর জার্মান উপজাতিদের আক্রমণে রোমের পতনের প্রায় হাজার বছর পরে তুর্কীদের আক্রমণে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্ট্যান্টিনোপলের পতন ঘটে। তুর্কী সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদ ১৪৫৩ খ্রীস্টাব্দে কনস্ট্যান্টিনোপল দখল করেন। বাইজান্টাইন সম্রাট নিহত হন। কনস্ট্যান্টিনোপল শহর লুণ্ঠিত হয়। **কনস্ট্যান্টিনোপলের পতন ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এর ফলে পৃথিবীর ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা হয়।** ১৪৫৩ খ্রীস্টাব্দে প্রাচীন রোমান সংস্কৃতির শেষ শিখাটি নির্বাপিত হয়। হাজার বছরের বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মুসলমানদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য বহু জ্ঞানী-গুণী কনস্ট্যান্টিনোপল ত্যাগ করে ইওরোপের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন। তাঁদের সঙ্গে ছিল প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু মূল্যবান পুঁথি। এইভাবে যে জ্ঞানবিজ্ঞান কনস্ট্যান্টিনোপলে সীমাবদ্ধ ছিল, তা সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে এবং ইওরোপে এক নবযুগের সূত্রপাত হয়। এই নবযুগের নাম **রেনেসাঁস বা নবজাগৃতি।** এই রেনেসাঁসের মাধ্যমেই ইওরোপীয়

ইতিহাস মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে প্রবেশ করেছে। কাজেই ১৪৫৩ খ্রীস্টাব্দে কনস্ট্যান্টিনোপলের পতনকে অধিকাংশ ঐতিহাসিক আধুনিক যুগের সূচনা বলে মনে করেন।

রেনেসাঁস কথাটির অর্থ নবজাগৃতি। সাধারণতঃ রেনেসাঁস অর্থে বোঝাত প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ। ব্যাপকভাবে রেনেসাঁস বলতে বোঝায় স্বাধীন চেতনা ও ব্যক্তিত্বের পুনর্জন্ম এবং ব্যাপক অনুসন্ধিৎসার মনোবৃত্তি। মধ্যযুগে খ্রীস্টধর্মাধিষ্ঠান ইওরোপের চিন্তাজগতকে নিয়ন্ত্রণ করত। স্বাধীন চিন্তা এবং ধর্মাধিষ্ঠানে প্রচলিত বিশ্বাসের বাইরে নতুন চিন্তাধারা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার কোন সুযোগ মধ্যযুগে ছিল না। গ্রীক চর্চা সেই মধ্যযুগীয় বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে স্বাধীন চিন্তাধারার সূচনা করে। এইভাবে মধ্যযুগীয় জড়তার অবসান ঘটে।

রেনেসাঁস শুধুমাত্র জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, ভাস্কর্য সর্বক্ষেত্রেই এক নতুন চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গীর সৃষ্টি হল। এই নবচেতনার ফলে মানুষের মনে এক নতুন ধর্মনিরপেক্ষ জীবন ও সমাজের আদর্শ দেখা দিল।

ইওরোপের এই নবজাগৃতি কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। দীর্ঘ দিন ধরে এই নবজাগৃতির পটভূমিকা তৈরী হচ্ছিল। ক্রুসেডের ফলে আরব সভ্যতার সঙ্গে ইওরোপীয়দের পরিচয় ঘটে এবং ব্যবসা বাণিজ্যের যথেষ্ট প্রসার ঘটে। ফলে ইওরোপের জ্ঞান ও শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন উদ্যম দেখা দেয়। ইওরোপের বিভিন্ন স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। মধ্য-যুগের শেষার্ধে প্রতিষ্ঠিত শহরগুলো ছিল ব্যক্তি স্বাধীনতা, আত্মনির্ভর-শীলতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার কেন্দ্রস্থল। নবচেতনার বিকাশে এই শহরগুলোর যথেষ্ট অবদান ছিল। কিন্তু প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য ও শিল্পের বিষয়বস্তু ছিল মানুষ ও ধর্মনিরপেক্ষ জ্ঞান। চতুর্দশ শতাব্দীতে ইতালীতে একদল মানবতাবাদী পণ্ডিত ধর্মনিরপেক্ষ জ্ঞানের চর্চা শুরু করেন। এঁদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন পেত্রার্ক ও বোকাশিও। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার এই জ্ঞান চর্চাকে সাধারণ

মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। এইভাবে দেখা যায় কনস্ট্যান্টিনোপলের পতনের বহু পূর্ব থেকেই ইওরোপে নবজাগৃতির পটভূমিকা তৈরী হয়েছিল। ১৪৫৩ খ্রীস্টাব্দে কনস্ট্যান্টিনোপলের পতনের পর গ্রীক পণ্ডিতদের আগমনে নবজাগৃতির ধারা গতিলাভ করে। এই নবজাগৃতির ফলেই আধুনিক যুগের সূচনা হয়।

ইওরোপের রেনেসাঁসের বা নবজাগৃতির বিশেষ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছিল। অদম্য অনুসন্ধিৎসা ও যুক্তিবাদ রেনেসাঁসের একটি বৈশিষ্ট্য। অন্ধ আজ্ঞাধীনতা ও কূপমণ্ডুকতা ছিল মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্য। সামন্তপ্রথা ও ধর্মাধিষ্ঠানের কর্তৃত্বের ফলে সমাজ ও ব্যক্তিগত জীবন ছিল শৃঙ্খলিত। রেনেসাঁস যুগের ধর্মনিরপেক্ষ জ্ঞানর্চ্চার ফলে গড়ে ওঠে সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গী ও বিভিন্ন বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা। এই অনুসন্ধিৎসার ফলে মানুষ জ্ঞানার্জনের পথে এগিয়ে যায়। আইন, ধর্মনীতি প্রভৃতি মধ্যযুগীয় শিক্ষা ত্যাগ করে ভূগোল, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, শিল্প-ভাস্কর্য প্রভৃতি চর্চ্চা শুরু হয়। যুক্তিবাদের ফলে শুরু হয় বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষামূলক গবেষণা। রেনেসাঁস যুগের পণ্ডিতরা প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদের বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সাফল্যগুলোকে নতুন করে আবিষ্কারের চেষ্টা করছিলেন। এ যুগের বৈজ্ঞানিক **কোপারনিকাস** প্রমাণ করেন যে পৃথীবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। প্রাচীন গ্রীক বৈজ্ঞানিকরা এই ধারণাই পোষণ করতেন ; কিন্তু মধ্যযুগের পণ্ডিতদের বিশ্বাস ছিল যে পৃথীবীকে কেন্দ্র করে সূর্য ও গ্রহ-নক্ষত্রেরা ঘুরছে। ইতালীর বৈজ্ঞানিক **গ্যালিলিও** দূরবীণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন এবং এই যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করেন কোপারনিকাসের মতবাদ অভ্রান্ত। নিউটন, কেপলার, টাইকো ব্রুহে, ব্রুনো, ইত্যাদি এ যুগের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক।

রেনেসাঁসের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ভৌগোলিক আবিষ্কার বা নতুন দেশ ও নতুন সমুদ্রপথ আবিষ্কারের আগ্রহ। রেনেসাঁসের যে ব্যপক অনুসন্ধিৎসার সৃষ্টি হয়েছিল, তা ভৌগোলিক জ্ঞান বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। পৃথিবীর বৃত্তাকার আকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান, নাবিকের

কম্পাস, সমুদ্রের মানচিত্র ইত্যাদি রেনেসাঁস যুগের প্রারম্ভেই আবিষ্কৃত হয়। ১৪৫৩ খৃস্টাব্দে কনস্ট্যান্টিনোপলের পতনের ফলে স্থলপথে প্রাচ্যদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ রুদ্ধ হয়। ফলে জলপথে প্রাচ্যদেশের সঙ্গে যোগাযোগের প্রয়োজনীতা বেড়ে যায়। ইওরোপের শহরাঞ্চলের বণিকশ্রেণী এই জলপথ আবিষ্কারের অর্থ এবং উৎসাহ যোগায়। ১৪৯২ খ্রীস্টাব্দে কলম্বাস প্রাচ্যদেশের জলপথ আবিষ্কারের চেষ্টায় আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছান। ১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দে ভাস্কো-ডা-গামা আফ্রিকা প্রদক্ষীণ করে ভারতে পৌঁছান।

রেনেসাঁস প্রসূত ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে একদিকে যেমন ভৌগোলিক জ্ঞানবৃদ্ধি পায়; অপরদিকে তেমনি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক জীবনেও পরিবর্তন আনে। ভৌগোলিক আবিষ্কারের আগে ভূমধ্যসাগর ছিল ইওরোপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য পথ। ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে আটলান্টিক, প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগর গুরুত্বপূর্ণ পথে পরিণত হয়। ফলে ভূমধ্যসাগরীয় বন্দরগুলোর গুরুত্ব হ্রাস পায়। বাণিজ্যের উপকরণ ও নতুন নতুন বাজার আবিষ্কৃত হওয়ায় উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন দেখা দিল। বড় বড় কারখানা এবং যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। আধুনিক সমাজ, রাষ্ট্রনীতি, চিন্তা-জগতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব বিপ্লবের সৃষ্টি করে। বাণিজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অনুন্নত দেশগুলোতে ইওরোপীয় দেশগুলো উপনিবেশ বিস্তার করতে থাকে। উপনিবেশগুলোতে ব্যবসার প্রয়োজনে দাস-শ্রমের প্রয়োজন দেখা দেয়। ফলে আফ্রিকা থেকে নিগ্রো অধিবাসীদের ধরে ক্রীতদাসে পরিণত করা শুরু হয়। উপনিবেশের অধিকার নিয়ে ইওরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহও দেখা দিয়েছিল।

মধ্যযুগের চিন্তায় সমগ্র ইওরোপ এক বিরাট ও অখণ্ড খ্রীস্টান সমাজরূপে গণ্য হত। পবিত্র রোমান সম্রাট ছিলেন ইওরোপের রাজনৈতিক প্রধান। বিভিন্ন দেশের রাজারা সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে

পরিগণিত হতেন। ধর্মের দিক থেকে বিভিন্ন দেশের রাজারা ও প্রজারা পোপের অধীন ছিলেন। তখন জাতীয়তাবোধ ও জাতীয় রাষ্ট্র বলে কিছুই ছিল না। সামন্ততন্ত্র প্রচলিত ছিল। সামন্ত প্রভুরা নিজ নিজ এলাকার স্বাধীন প্রভূ ছিলেন। মধ্যযুগে পোপ ও সম্রাটের মধ্যে যে প্রধান্যের দ্বন্দ্ব চলেছিল, তাতে উভয় পক্ষের-ই শক্তি ক্ষয় হয়। আধুনিক যুগের প্রারম্ভে শহর প্রতিষ্ঠা ও বণিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভবের ফলে সামন্ত প্রভুরা দুর্বল হয়ে পড়ে। মধ্যবিত্ত ও বণিকশ্রেণী রাজ শক্তির সহায়ক ছিল। সামন্ত প্রভুদের স্বাধীনতা খর্ব করে রাজারা এই সময় শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকে। বারুদ ও আগ্নেয়াস্ত্রের আবিষ্কার রাজশক্তিকে অপ্রতিহত করে তোলে। ফলে ইওরোপের বিভিন্ন দেশে জাতীয় স্বাতন্ত্রবোধ ও আত্মপ্রত্যয় দেখা দেয়। ফ্রান্স ইংলণ্ড স্পেন, পর্তুগাল প্রভৃতি দেশে অবাধ রাজশক্তির অভ্যুদয়ের ফলে জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় এই সব দেশে রাজারা ছিলেন বুর্জোয়া শ্রেণীর সহযোগী। বুর্জোয়া শ্রেণী রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন ও স্বায়ত্ব শাসন অধিকারের প্রশ্নে সামন্ত প্রভুদের সঙ্গে যে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল, নেদারল্যাণ্ডের বিদ্রোহ ছিল তার একটি দৃষ্টান্ত। অর্থনেতিক দিক থেকে উন্নত হলেও নেদারল্যাণ্ড ছিল স্পেনের অধীন। স্বায়ত্ত শাসন অধীকারের জন্য ১৫৬৬ থেকে ১৬০৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত নেদারল্যাণ্ডের বুর্জোয়া শ্রেণী সংগ্রাম চালায় এবং স্বাধীনতা অর্জন করে। এইভাবে আমরা দেখতে পাই আধুনিক যুগের প্রারম্ভে সমাজ ও রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটে।

ইওরোপের বাইরে ইওরোপীয় দেশগুলোর উপনিবেশ বিস্তার আধুনিক যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে নতুন নতুন দেশ ও জলপথ আবিষ্কৃত হওয়ায় ইওরোপীয় দেশগুলো উপনিবেশ বিস্তার করতে থাকে। স্পেন, পর্তুগাল, হল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিকা, ইত্যাদি মহাদেশে নিজেদের উপনিবেশ গড়ে তোলে। এই উপনিবেশ গুলো লুণ্ঠন ও শোষণের মাধ্যমে বুর্জোয়া শ্রেণীর আর্থিক সমৃদ্ধি ঘটে।

সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীদের হাত থেকে বুর্জোয়াদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং সেই সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে ধনতন্ত্র নামে এক নতুন সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জয়লাভ, আধুনিক যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। চতুর্দশ শতাব্দীতে সামন্ত সমাজের প্রথম পরিবর্তনের সূচনা হয় কৃষকদের মধ্যে। ভূমির মালিক অভিজাতদের শোষনের বিরুদ্ধে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়। ইংলণ্ডে কৃষক বিদ্রোহের ফলে পঞ্চদশ শতাব্দীর পর ইংলণ্ডে আর কোন ভূমিদাস রইল না।

সামন্ত সমাজের প্রাধান্য বিনষ্ট করে বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য ইংলণ্ডে সপ্তদশ শতাব্দীতে যে বিপ্লব হয়, পৃথিবীর ইতিহাসে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইংলণ্ডে রাজশক্তির সমর্থক ছিল সামন্তপ্রভু এবং প্রাচীনপন্থী পুরোহিতরা। বুর্জোয়াশ্রেণী পার্লামেন্টে শক্তিশালী হয়ে উঠলে, ইংলণ্ডে পার্লামেন্ট ও রাজশক্তির সঙ্গে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। রাজা পরাজিত হন। ১৬৮৮ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডে পূর্বতন রাজবংশের স্থলে বুর্জোয়ারা নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করে। এই রাজ-বংশের ক্ষমতা পার্লামেন্ট দ্বারা সীমিত ছিল। এইভাবে ইংলণ্ডে সামন্ততন্ত্রের শেষ চিহ্নটুকু বিলুপ্ত হয়। বুর্জোয়া প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে ইংলণ্ডের বুর্জোয়া বিপ্লবের গুরুত্ব ছিল অত্যন্ত বেশী এবং এই ঘটনা থেকেই আধুনিক ইতিহাস অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক সমাজের ইতিহাসের শুরু।

অনুশীলনী

১। কনস্ট্যান্টিনোপলের গুরুত্ব সংক্ষেপে আলোচনা কর।

২। "রেনেসাঁস" কথাটির অর্থ কি? রেনেসাঁসের ফলে কিভাবে আধুনিক যুগের সূচনা হয়?

৩। ভৌগোলিক আবিষ্কারের সূচনা হয় কখন? এর গুরুত্ব কি?